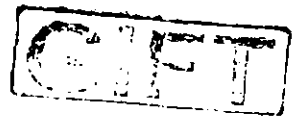

GIFT

জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যের বিষয় ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য

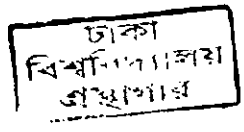

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

জান্নাতুল ফেরদৌস

449910

Dhaka University Library
449910

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

বাংলা বিভাগ

জানুয়ারী-২০১১

449910

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

জসীম উদ্‌দীনের কাহিনী কাব্যের বিষয় ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

449910

জান্নাতুল ফেরদৌস

জসীম উদ্‌দীনের কাহিনী কাব্যের বিষয় ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য

জান্নাতুল ফেরদৌস

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

449910

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

জানুয়ারী-২০১১

জান্নাতুল ফেরদৌস কর্তৃক উপস্থাপিত 'জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যের বিষয় ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

প্রসঙ্গ কথা

এম. এ. পাশ করার পর বাংলা সাহিত্যের কোন একটি অনালোচিত দিক নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করার জন্য আমার আগ্রহ জন্মে। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ-এর কাছে পরামর্শ নিতে গেলে তিনি জসীম উদ্‌দীনের কাহিনী কাব্যের বিষয় ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কাজ করতে বলেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করতে চাইলে তিনি সম্মত হন। সে অনুযায়ী তাঁরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এম. ফিল কোর্সের দ্বিতীয় বছর এই গবেষণাপত্রটি রচনা করা হয়েছে। জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যের বিষয় ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য, কাহিনী কাব্যগুলোর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই বিষয়টি যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি এখানে। জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্য নিয়ে কাজ করার আগ্রহ থাকলেও আমার ক্ষমতা অত্যন্ত কম। তদুপরি নির্ধারিত এক বছরের মধ্যে আমাকে কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। এই গবেষণা কাজে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আমাকে ফেলোশীপ প্রদান করে গবেষণা করার সুযোগ করে দিয়েছেন। কবি সম্পর্কে আমার ধারনা সীমিত। তবুও কাজ করতে পেরেছি ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ স্যারের উদার সহযোগিতায়। তাঁর পরামর্শ এবং উপদেশ পেয়েছি সর্বক্ষণ। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সাঈদ-উর রহমান আমার গবেষণার কাজে নানাভাবে সহযোগিতা করে আমাকে ঋণী করেছেন। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। যিনি আমার গবেষণা কর্মের নেপথ্যে থেকে নিরন্তর উৎসাহ যুগিয়েছেন তিনি ড. নাসিমা চৌধুরী। বিভিন্ন সময় আমার লেখাপড়ার খোঁজ-খবর নিয়েছেন এবং আর্থিক সহযোগিতা করেছেন আমার বন্ধুপ্রতিম সহোদর জনাব আলীমূল রাজী।

অভিসন্দর্ভ রচনা করতে গিয়ে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এ সূত্রে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই।

জান্নাতুল ফেরদৌস

জসীম উদ্‌দীনের কাহিনী কাব্যের বিষয় ও প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	: অবতরণিকা	১-৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	: জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যের বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনা	৪-৯০
তৃতীয় অধ্যায়	: জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যের কাহিনী গ্রন্থনের বৈশিষ্ট্য	৯১-১২৫
চতুর্থ অধ্যায়	: জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য	১২৬-১৬৯
পঞ্চম অধ্যায়	: উপসংহার	১৭০-১৭৪
গ্রন্থপঞ্জি	:	১৭৫-১৭৭

প্রথম অধ্যায়
অবতরণিকা

অবতরণিকা

বাংলা কাব্য-সাহিত্যে জসীমউদ্‌দীন কাব্যকলা নির্মাণে একটি বিশিষ্ট নাম। তিনি খণ্ড কবিতা ও কাব্য-কাহিনী রচনা উভয় ক্ষেত্রেই সার্থকতা লাভ করেছেন। তিনি ছাত্র জীবনেই 'কবর' কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে কবিখ্যাতি লাভ করেন। তিনি 'পল্লীকবি' নামে পরিচিতি লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি 'মহুয়া' বা 'দেওয়ান-মদিনার' রচয়িতাদের সমধর্মী পল্লী কবি নন। তাঁর কবিতা ও কাহিনী কাব্য পল্লীর প্রকৃতি, পল্লীর মানুষ ও পল্লীজীবন কেন্দ্র করে রচিত হলেও শব্দ ব্যবহার ও অলংকার প্রয়োগে তিনি গ্রামীণ মানসিকতার পরিচয় দেননি। তাঁর কবিতায় পল্লীর সার্বিক রূপ বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বলেই তাঁকে 'পল্লীকবি' অভিধায় চিহ্নিত করা হয়। কবি জসীমউদ্‌দীন খণ্ড কবিতা ও কাহিনী কাব্য ছাড়াও অসংখ্য গান, গীতিনাট্য, ভ্রমণ কাহিনী ও গদ্য-সাহিত্য রচনার জন্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় বর্ণনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল যে কোন বস্তুর (Object) বিভিন্ন অংশের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান তা নির্দেশ করে বস্তুর সামগ্রিক রূপ নির্মাণ। কবি জসীমউদ্‌দীনের চারটি কাহিনী কাব্য গবেষণার জন্য গৃহীত হওয়ায় এই কাব্যগুলি বিশ্লেষণে বর্ণনামূলক পদ্ধতি বিশেষ সহায়ক হবে। এই পদ্ধতি প্রয়োগে প্রত্যেকটি কাহিনী কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনে বিশেষ কৌশল এবং কাহিনীর প্রয়োজনে যে ভাবে চরিত্র নির্মিত -এই দুটি দিক কিভাবে একত্রিত হয়ে একই গতিতে অগ্রসরমান তার উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। কাব্যের বিভিন্ন উপাদান, যেমন কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, উপমা একই গঠনের মধ্যে দিয়ে একটি সামগ্রিক রূপ নির্মাণ করেছে, তার যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা বর্ণনার মাধ্যমে

প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যত্র, চারটি কাহিনী কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনে পার্থক্য, চরিত্র সৃষ্টিতে স্বাতন্ত্র্য, কলাবিধির বৈচিত্র্যগত দিকও বিভিন্ন অধ্যায়ে নির্দেশিত।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায় যেভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে নিচে নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্য, কবি জসীমউদ্‌দীনের কাহিনী কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রসঙ্গে বিষয় ব্যাখ্যার দিক সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কবি জসীমউদ্‌দীন যে কাহিনী কাব্য চতুষ্টয় রচনা করেছেন সেগুলির ভাব ও ভাষা সমান্তরাল নয়। 'নক্সী কাঁথার মাঠ' ও সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাহিনী কাব্যের মধ্যে প্রকরণগত দিক ও কাহিনী গ্রন্থনের দিক থেকে খানিকটা মিল লক্ষ্য করা গেলেও ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়। 'সকিনা' ও 'মা যে জননী কান্দে' কাহিনী কাব্য পূর্বের দুটি কাব্যের তুলনায় খানিকটা ভিন্নতর কাহিনী ও চরিত্র নির্মাণের দিক থেকে। এখানে কাব্য-ভাষারও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শেষোক্ত দুটি কাব্যে গ্রামীণ জীবনের স্নিগ্ধ রূপের পরিবর্তে গ্রাম ও শহরের মিশ্র রূপ প্রাধান্য পেয়েছে। জসীমউদ্‌দীনের চারটি কাহিনী কাব্যের কাহিনী, চরিত্র ও কাব্যকলার মধ্যে যে পার্থক্য বর্তমান অধ্যায়ে তার একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

জসীমউদ্‌দীন চারটি কাহিনী কাব্যের কাহিনী গ্রন্থন করেছেন পল্লীপ্রকৃতি, পল্লীজীবন ও বিভিন্নধারিক জীবন-বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়ে। পল্লীর কিশোর-কিশোরীর প্রেম ও সবর্ণ বিয়ে, তরুণ-তরুণীর প্রেম ও অসবর্ণ বিবাহ ও তার ফলে সামাজিক অসন্তোষ, দরিদ্র ঘরের সুন্দরী কুমারীর সৌন্দর্যের কারণে জীবনের চরম দুর্গতি- এই দিকগুলি কবি তাঁর কাহিনী কাব্যে স্বতন্ত্র রূপে গ্রন্থন করে জীবনের হতাশার চিত্র এঁকেছেন।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে কবির কাহিনী কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সুনিপুণ মালাকরের মত কবি কাব্য রচনার সময় রূপগত বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি রসগত বৈশিষ্ট্যের ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ করেন। কবি জসীমউদ্‌দীন কাব্য রচনার সময় কাহিনী গ্রন্থণ ও চরিত্র নির্মাণের সময় কাব্যে শব্দ, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ব্যবহারে বিশেষ সচেতন ছিলেন। কাব্যকলার এই দিকের সুপ্রয়োগ কাহিনীর ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টিতে সহায়ক। কাহিনী হল কাব্যের দেহ আর কাব্যকলাবিধি কাব্যের প্রাণ। কাব্যের এই দিকটি চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যার চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

এই অধ্যায়ে বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত দিক উপস্থাপন করা হয়েছে। কোন আলোচনাই পূর্ণতা দাবী করে না এবং ভবিষ্যতে অনালোচিত দিক নতুন আলোকে সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়। বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনার প্রাথমিক দিকগুলি এখানে সংক্ষেপে নির্দেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যের বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনা

জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যের বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনা

নক্সী-কাঁথার মাঠ

কবি জসীম উদ্‌দীনের প্রথম কাহিনীকাব্য 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' পল্লী জীবনের দুজন কিশোর-কিশোরীর প্রেম, বিবাহ ও বিয়োগান্ত পরিণতির কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কাহিনীকাব্যের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হলো–একটি কাহিনীর মাধ্যমে নাটকীয়তা ও সাহিত্য রস সৃষ্টি। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' চৌদ্দটি নাতিদীর্ঘ অধ্যায়ের মাধ্যমে প্রথমাংশেই ট্রাজিক পরিবেশের ইঙ্গিত, রূপাই ও সাজুর বর্ণনা, গ্রামীণ খরা ও লোক জীবনের বৈশিষ্ট্য, সাজু ও রূপাই এর পারস্পরিক আকর্ষণ ও বিয়ে, ধান কেটে নিয়ে যাওয়ার কারণে এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের বিরোধ ও সংঘাত, প্রতিপক্ষের গ্রামবাসীকে হত্যার পর পুলিশের ভয়ে রূপাই এর পালিয়ে যাওয়ার কাহিনী অন্ত র্ভুক্ত। স্বামীর প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশায় সাজুর বিরহপূর্ণ দিন যাপন, নিজেদের জীবনের ঘটনা অবলম্বনে নক্সী কাঁথা সেলাই এবং সাজুর মৃত্যুর পর রূপাইয়ের গ্রামে প্রত্যাবর্তনের পর স্ত্রীর কবরের ওপর নক্সী-কাঁথা বিছিয়ে দিয়ে রূপাইয়ের মৃত্যু।

কবি সুনিপুনভাবে 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যে দুজন কিশোর-কিশোরীর প্রেম, বিরহ জীবনের উত্থান-পতন ও মৃত্যুর কাহিনীর কাব্যিক বর্ণনা দিয়েছেন। বেদনা ও বিরহের ব্যথাতুর কাহিনী এ কাব্যের আশ্রয়। জসীম উদ্‌দীন 'নক্সী-কাঁথার মাঠ'-এর প্রতিটি অধ্যায়ে গ্রামীণ গানের উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন ঘটনার ইঙ্গিত দানের কারণে। কাব্যের শুরুতেই নিম্নোক্ত গানের অংশ উদ্ধৃত হয়েছে–

বন্ধুর বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে ক্ষীর নদী,
উইড়া যাওয়ার সাধ ছিল, পাঙ্খা দেয় নাই বিধি।

[রাখালী গান, নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৯]

'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যে জসীম উদ্‌দীন যে বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করেছেন তা গ্রাম-জীবনের অতি পরিচিত বাস্তব চিত্র, গ্রামীণ লোকাচার, গ্রামীণ উপাদান এর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ কবি মূলত পল্লীর বিষয়বস্তুর উপর ভর করে তাঁর কাহিনী কাব্যকে সু-কৌশলে সুশৃঙ্খলভাবে মালার পর মালা গেঁথে সুগঠিত রূপ দিয়েছেন। গ্রামীণ বিষয়বস্তু ও উপাদান তাঁর কাব্যের মৌলিক দিক হলেও উপস্থাপনায় কোন রকম গ্রাম্যতা লক্ষ করা যায়নি। কারণ পল্লীর বিষয়বস্তুকে কাব্যে রূপদান করলেও তা তিনি উপস্থাপন করেছেন সার্থক সাহিত্যিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তিনি পল্লীর সবুজ ও শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে বড় হয়েছেন, তাঁর মানসলোকে ছিল পল্লীর দ্যুতিময় ভাবনা। তিনি পল্লীর মানুষের দুঃখ-বেদনা, হাসি-কান্না অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। জসীম উদ্‌দীনের 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যের নর-নারীর জীবন-চেতনা গড়ে উঠেছে গ্রামীণ জীবনের প্রাত্যাহিক জীবনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। পল্লীর মানুষ ও জীবনের প্রতি ছিল কবির স্বাভাবিক অনুরাগ, এই অনুরাগ পল্লীর মানুষ লতা-পাতা, বাঁশ-ঝাড়, নালা-ডোবা, মাঠ-ঘাট বউ টুবানী বাবুই পাখির মতো প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কে জড়িত হয়ে বিশ্বস্ত রূপ পেয়েছে। কাহিনীর শুরুতেই দেখা যায়–দুটি গ্রাম সহোদরের মত পাশাপাশি অবস্থান করলেও তাদের মধ্যে সদ্ভাব ও অসদ্ভাব বিদ্যমান। দুগ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত মাঠটি দুগ্রামকে বিভক্ত করে রেখেছে। এই মাঠই পরবর্তীকালে বিরহ-বিধূর জীবন স্মৃতি বহন করে 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' নামে পরিচিতি লাভ করে। এক গ্রাম ফাঁকা ফাঁকা ঘর-বাড়ি, অন্য গ্রাম ঘনবসতিপূর্ণ। কবি দুই গ্রামের বর্ণনা দিয়েছেন নিম্নোক্ত রূপে-

এই এক গাঁও, ওই এক গাঁও মধ্যে ধু ধু মাঠ,
ধান কাউনের লিখন লিখি করছে নিতুই পাঠ।
এ-গাঁও যেন ফাঁকা ফাঁকা, হেথায় হোথায় গাছ;
গেঁয়ো চাষীর ঘরগুলি সব দাঁড়ায় তারি পাছ।
ও–গাঁয় যেন জমাট বেঁধে বনের কাজল-কায়া,
ঘরগুলিরে জড়িয়ে ধরে বাড়ায় ঘরের মায়া।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৯]

পল্লীর দুটি গ্রাম পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য মেলে। দুই গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত বিলের কাজল জলে পদ্ম ফুল মনের আনন্দে ভেসে থাকে। গ্রামীণ প্রবাদ মতে দুই গ্রামের তরুণ-তরুণীর প্রেমের লাবণ্য ও তাদের ব্যর্থ প্রেম বিলের পদ্মের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে বিরহের শোকগাথা প্রসারিত করে। তাদের গলার মালা থেকেই বিলের পানির ওপর শাপলা জন্ম নিয়ে তাদের রক্তিম প্রেমের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পাশাপাশি অবস্থিত দুই গ্রামের মধ্যে সখ্যতার অভাব হলেও, নিভৃতে একটা সখ্যতার বন্ধন গড়ে উঠেছে এ গ্রাম্য বধূদের কলসিতে পানি ভরার সময় জলের আন্দোলন অন্য ঘাটে স্পর্শ করার মধ্যে। এক গ্রামের বাঁশির সুর অন্য গ্রামের নারীর হৃদয় স্পর্শ করে নিজেদের মনের অগোচরে। কবি প্রথম অধ্যায়ে কাহিনীর মাধ্যমে পরবর্তী বিরহ-বেদনার ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন রূপকল্প নির্মিতির মাধ্যমে।

কাব্যের প্রথমাংশ শুরু হয়েছে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি পল্লীগ্রাম বর্ণনার মাধ্যমে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গ্রামীণ লোকাচার ও বিশ্বাস। যেমন- রূপাই এর বাঁশ কাটার সময় তার পরিচয় পেয়ে সাজুর মা তাকে নিজেদের বাড়িতে দুপুর বেলা দাওয়াত করে খাওয়ায়। এখানে কবি গ্রামীণ লোকাচার এর বর্ণনা দিয়েছেন অতিথি আপ্যায়নের বিভিন্ন আচারের মাধ্যমে-

যাহোক রূপাই বাঁশ কাটিয়া এল খালার বাড়ি,
বসতে তারে দিলেন খালা শীতল পাটি পাড়ি।
বদনা ভরা জল দিল আর খড়ম দিল মেলে,
পাও দুখানি ধুয়ে রূপাই বসল বামে হেলে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ২৮]

বাড়িতে পরিচিতরা বেড়াতে এলে তার জন্য শীতল পাটি বিছিয়ে দেওয়া এবং মোরগ ধরে মাংস রান্না করা এসবই গ্রামীণ লোকাচার যা কাব্যে পরিস্ফুট। লোকাচারের সঙ্গে পল্লীর কিছু কিছু বিশ্বাস গ্রামীণ মানুষ অন্তরে লালন করে আসছে বংশ পরম্পরায়। যেমন- প্রচণ্ড খরার দিনে যখন বৃষ্টি নামার কোন নাম গন্ধ থাকে না তখন গ্রামের সহজ-সরল মানুষ বিশ্বাস করে যে বদনা বিয়ে দিলে এবং মেঘের গান করলে আশু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে। তাই গ্রামের মেয়ের দল বেধে বাড়ি বাড়ি যায় বারো মেঘের গানের মাধ্যমে বদনা বিয়ের নামে মাঙন মাঙতে যা লৌকিক বিশ্বাসের অন্তর্গত। যেমন-

"কালো মেঘা নামো নামো, ফুল-তোলা মেঘ নামো,
ধূলট মেঘা, তুলট মেঘা, তোমরা সবে ঘামো!
কানা মেঘা, টলমল বারো মেঘের ভাই,
আরো ফুটিক ডলক দিলে চিনার ভাত খাই!

কাজল মেঘা নামো নামো চোখের কাজল দিয়া,
তোমার ভালে টিপ আঁকিব মোদের হলে বিয়া!
আড়িয়া মেঘা, হাড়িয়া মেঘা, কুড়িয়া মেঘার নাতি,
নাকের নোলক বেচিয়া দিব তোমার মাথার ছাতি।
কৌটা ভরা সিঁদুর দিব, সিঁদুর মেঘের গায়,
আজকে যেন দেয়ায় ডাকে মাঠ ডুবিয়া যায়।"

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ২০-২১]

লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, বারো মেঘের নাম ধরে গ্রামের মেয়েরা বদনা বিয়ে দেয়। গ্রামীণ বিয়ের যে উৎসব এবং মুসলিম সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানে গানের আসর বসানো এবং কেতাব পড়ার যে রীতি, কবি তার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন-

'কেতাব পড়ার উঠল তুফান, চম্পা, কালু-গাজী
মামুদ হানিফ সোনাবান ও জয়গুন বিবি আজি;

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৪৩]

বিয়ের উৎসবে অনেক সময় দুপক্ষের আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করে বিবাদের সূচনা হলেও পরক্ষণেই মোড়লের উপস্থিতিতে তা মিটমাট হয়ে যায় বোঝায় উপায় থাকে না যে কিছুক্ষণ আগে এখান দিয়ে বিবাদের তুফান বয়ে গেছে। এসবই পল্লী জীবনাচারের সাধারণ প্রকৃতি।

'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাহিনী কাব্য গড়ে উঠেছে গ্রাম্য এক কিশোর-কিশোরীর প্রেমের মধ্য দিয়ে। জলির বিল দ্বারা পৃথক এক গ্রামের কিশোর ছেলে ও অন্য গ্রামের কিশোরী মেয়ের যে প্রেমের উন্মেষ ও পরিণতি ঘটে তাই এই কাব্যের কাহিনীর

বিষয়বস্তু। কাহিনীকে চৌদ্দটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে কবি অত্যন্ত সাবলীলভাবে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়েছেন। নতুন প্রেম পত্র পল্লবে বিকশিত হওয়ার দিক রসঘন দৃষ্টিতে কাব্যে বর্ণিত। প্রেমের উন্মেষ, আনন্দ-বেদনা, ভালবাসার লুকোচুরি খেলা, কলঙ্ক রটানো, বিয়ে-বাসর, গৃহস্থালি, হাসি-কান্না, দাঙ্গা এবং বিরহ-সবই এই কাব্যে বিস্তৃত রূপে চিত্রিত।

সাজুর প্রতি অনুরক্ত রূপাই এর চিত্ত চাঞ্চল্যের দিক কবি সুচারুভাবে অঙ্কন করেছেন। প্রেমাসক্ত মনের কারণে মাঠে মন বসে না রূপাইয়ের হয় খাদ্যে অরুচি, গানের আসরে অনুপস্থিতি এসবই জসীম উদ্‌দীন এঁকেছেন নিখুঁতভাবে। গ্রামীণ নিষ্কলঙ্ক কিশোর-কিশোরীর প্রথম ভাল লাগার যে অনুভূতি কবি এঁকেছেন তা বাস্তব রূপে বর্ণিত। এখানে কৃত্রিমতা অনুপস্থিত, নিটোল নির্ভেজাল প্রেম কাব্যের শেষ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বদনা বিয়ের মাঙনের দিনে রূপাই এর সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয় সাজুর। প্রেমের পূর্ব রাগের সৃষ্টি হয় সেখানেই। প্রথম দর্শনেই রূপাই এর মনে হয় জগতের সব রূপ সৌন্দর্য বিধাতা যেন এই মেয়েটির মধ্যে দিয়েছেন-

রূপাই ছিল ঘর বাঁধিতে, পিছন ফিরে চায়,
পাঁচটি মেয়ের রূপ বুঝি ওই একটি মেয়ের গায়!

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ২১]

প্রথম দর্শনেই সাজুর প্রতি রূপাই আকৃষ্ট হয়। রূপাই এর মা মাগনের ধান এক সের দিলে সে মাকে অতিরিক্ত উৎসাহে থামিয়ে নিজের হাতে পাঁচ সের ধান ও এক সের সোনা মুগের ডাল দেয়। যেমন–

রূপাইর মা দিলেন এনে সেরেক খানেক ধান,
রূপাই বলে, "এই দিলে মা থাকবে না আর মান।"
ঘর হতে সে এনে দিল সেরেক পাঁচেক চাল,
সেরেক খানেক দিল মেপে সোনা মুগের ডাল।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ-পৃষ্ঠা-২৩]

দুজন কিশোর-কিশোরীর ভালোবাসা কিভাবে মনের নিভৃতে জায়গা করে নেয় তার চিত্র কবি জীবন্ত ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন-

এমনি করিয়া দিনে দিন যেতে দুইটি অরুণ হিয়া,
এ উহারে নিল বরণ করিয়া বিনি সুতি মালা দিয়া।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ-পৃষ্ঠা-৩০]

প্রথম প্রেমের অনুরাগ থেকে বের হয়ে তারা যখন বাস্তবের দ্বার প্রান্তে উপস্থিত তখন তাদের প্রেমের মধ্যে কিছুটা জটিলতা দেখা দেয়। তবে তা স্থায়ী রূপ পায়নি। পল্লী প্রকৃতিতে লালিত দুই কিশোর-কিশোরীর প্রেমের আরম্ভ বিস্তার ও শেষ পরিণতির কাহিনী জসীম উদ্‌দীন পল্লীর উপাদান দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে এঁকেছেন। এ কাব্যে প্রেম-ভালবাসা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পাশাপাশি অবস্থান করেছে জীবনের আনুষঙ্গিক উপাদান হিসাবে। জসীম উদ্‌দীনের এই কাব্যের মধ্যে প্রতিটি অন্তরঙ্গ বর্ণনায় পল্লীর অন্দরের চিত্র অবলোকন করা যায়। বন-গেঁয়োরা চর দখল করতে আসার সময় দুপক্ষের হাঙ্গামার চিত্র বাস্তব রূপে উপস্থাপিত-

হাজার লেঠেল হুঙ্কারী কয় "আলী আলী হযরত আলী",
সুর শুনে তার বন-গেঁয়োদের কর্ণে বুঝি লাগল তালি,
তারাও যবে আসল জুটে দলে দলে ভীম পালোয়ান,
"আলী আলী" শব্দে যেন পড়ল ভেঙে সকল গাঁ খান!

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৫৮]

দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে রূপাই ফেরার হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে শুরু হয় সাজুর বিরহ তাপিত জীবন। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হলেও রূপাই ফিরে আসে না।

প্রতীক্ষারত বিরহ-বিধূরা সাজু নিজের সংসার জীবনের আলেখ্য নিয়ে নক্সী কাঁথা সেলাই করে দিন অতিবাহিত করে। সাজুর মৃত্যুর পর তার ইচ্ছানুসারে তার কবরের ওপর এই কাঁথা বিছিয়ে দেয়া হয়। রূপাই গ্রামে প্রত্যাবর্তনের পর নিজের স্ত্রীর কবর ও নক্সী কাঁথা দেখে তার প্রতি ভালোবাসার জন্য আত্মত্যাগী সাজুর কবরের পাশে সেও ঢলে পড়ে মৃত্যুর কোলে। কবি এই অংশের নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন: যেমন-

বহুদিন পরে গাঁয়ের লোকেরা গভীর রাতের কালে,
শুনিল কে যেন বাজাইছে বাঁশী বেদনার তালে তালে।
প্রভাতে সকলে দেখিল আসিয়া সেই কবরের গায়,
রোগ পাণ্ডুর একটি বিদেশী মরিয়া রয়েছে হায়!
শিয়রের কাছে পড়ে আছে তার কখানা রঙিন শাড়ী,
রাঙা মেঘ বেয়ে দিবসের রবি যেন চলে গেছে বাড়ি!
সারা গায় তার জড়ায়ে রয়েছে সেই সে নক্সী-কাঁথা,
আজও গাঁর লোকে বাঁশী বাজাইয়া গায় এ করুণ গাথা।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ৭৯-৮০]

মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেন দুজন দুজনের কাছে ফিরে গেছে যা কবির কাব্যের প্রথমেই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নক্সী-কাঁথার মাঠ কাব্য গ্রামীণ জীবনে গাঁথা হিসাবে সার্থকতা লাভের নেপথ্যে পল্লীর অনাবিল সহজ জীবন প্রেমে বিশ্বস্ততা ও চরিত্রাঙ্কনে বাস্তবতার ক্রিয়াশীল রূপ লক্ষ করা যায়। কাব্যের প্রধান চরিত্র সাজু-রূপাই এর চরিত্র সৃষ্টিতে কবির যে দক্ষতা তা অপ্রধান চরিত্র নির্মাণেও একই রূপে লক্ষণীয়। কাব্যের প্রধান চরিত্র রূপাই এর বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি দৈহিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সংযোগ ঘটিয়েছেন। যেমন-

কাঁচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,
গা খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-১৩]

শুধু তাই নয় কৃষ্ণ বর্ণের এই কৃষক ছেলে রূপাই সকলের মন জয় করেছে। যেমন-

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দাতের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়।
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-১৩]

দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি রূপাই এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক ও রূপ কাব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন-

আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারীর গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
"শাল-সুন্দী-বেত" যেন ও, সকল কাজেই লাগে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-১৫]

রূপাই এর যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিবিধ গুণাবলির পরিচয় পাওয়া যায় যা একজন তরুণকে গ্রামবাসীর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে সহায়ক হয়েছে।

কাব্যে দ্বিতীয় প্রধান চরিত্র সাজুর রূপের বর্ণনাতেও তিনি প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সংযোগ ঘটিয়েছেন। যেমন-

লাল মোরগের পাখার মত উড়ে তাহার শাড়ী,

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-১৬]

অনেক সময় গ্রাম সংস্কৃতিতে প্রকৃত নামের পরিবর্তে পরিবারের সেজ মেয়েকে সাজু বলে ডাকা হত। যেমন-

সেই খানে এক চাষীর মেয়ে নামটি তাহার সোনা,
সাজু বলে ডাকে সবে নাম নিতে যে গোনা।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-১৬]

কবি সাজুর দেহবল্লরীকে তুলসীতলার প্রদীপের সাথে তুলনা করেছেন। এই বর্ণনায় সাজু চিত্রিত হয়েছে সহজ-সরল অথচ প্রেমে তেজস্বিনী এক নারী হিসেবে। গ্রাম্য মেয়েদের তুলনায় সাজুরও রয়েছে বিভিন্ন রকম গুণ–হাঁড়িতে চিত্র আঁকা নক্সী করা পাকান পিঠা চেকন সেমাই, শিকায় ফুল তোলা ইত্যাদি। বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত গুণি নায়িকার জন্য জসীম উদ্‌দীন প্রকৃত নায়ককেই বেছে নিয়েছেন যে বলিষ্ঠ ও অকুতভয় প্রকৃত পৌরুষের অধিকারী।

গ্রামীণ কিশোরের এই সুচারু রূপ বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে সহজে লক্ষ করা যায় না। কবি পর্যায়ক্রমে কাব্যে কাহিনীর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও জীবনের

দ্বন্দ্ব তুলে ধরেছেন। প্রথম যৌবনের প্রেম কাহিনী প্রেমের আবহ বর্ণনায় তিনি দুটি ভিন্ন গ্রামের কিশোর-কিশোরীর পরিচয় পর্ব অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে উপস্থাপন করেছেন খর গ্রীষ্মের দাবদাহের মধ্য দিয়ে, বৃষ্টির আশায় গ্রামীণ সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে।

জসীম উদ্‌দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাব্যের আরো কয়েকটি চরিত্র আপন মহিমায় মহিমান্বিত। প্রথমেই রূপাই-এর মা এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়। তাঁর-জীবনচারিতা বাস্তব রূপের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সাজুর মা এর কাছে থেকে তীর্যক কথা শোনার পর রূপাই এর জীবন-যাত্রা স্থবির ও মন নিস্তরঙ্গ হয়ে পড়ে। দিনে দিনে ছেলের ভগ্নদশা দেখে মা শংকিত হন। তিনি ছেলের জন্য পড়া পানি খেতে দেন এবং পীরের সিন্নি মানত করেন। একজন স্নেহময়ী বিধবা মা এর কাছে জগতের সব চেয়ে প্রিয় বস্তু তাঁর সন্তান। সন্তানের অসুস্থতায় মা এর ব্যাকুলতার পরিচয় অত্যন্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন নিচের চরণগুলিতে-

"শানাল পীরের সিন্নি মানিল খেতে দিল পড়া পানি,
দেহের দৈন্য দেখিলে জননী, দেখিল না প্রাণখানি।
সারা গায়ে মাতা হাত বুলাইল চোখে মুখে দিল জল,
বুঝিল না মাতা বুকের ব্যথার বাড়ে যে ইহাতে বল।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৩৩]

এক সময় রূপাই এর মা পুত্রের অসুস্থতার প্রকৃত কারণ উপলব্ধির পর তার প্রতিকারে অগ্রসর হন। সাজুর প্রতি রূপাই এর আন্তরিক অনুরাগ মা মেনে নিয়ে ছেলের সঙ্গে সাজুর বিয়ে দিতে মনস্থির করে ফেলেন। রূপাই এর স্নেহময়ী মা আনন্দচিত্তে বলে ওঠেন-

"ও রূপা, তুই কোথায় গেলি? ভাবিসনাক মোটে,
কপাল গুণে বিয়ে যে তোর সাজুর সাথেই জোটে!"

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৪২]

জসীম উদ্‌দীন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পল্লীর স্নেহময়ী মাতার চিত্র অঙ্কিত করেছেন। অপর একটি চরিত্র কাব্য মধ্যে বিশেষভাবে উজ্জ্বল। গ্রামের নর-নারীর বিয়ের সম্বন্ধ ঘটাতে যার কোন জুড়ি নেই। তার পরিচিতি দুখাই ঘটক হিসাবে। এই চরিত্র অনেকটা কৌতুকপূর্ণ হলেও তার মধ্যে বিশেষ একটি দিক কবি তুলে ধরেছেন, যার মাধ্যমে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটক মাত্রই বেশি বাড়িয়ে বলে। ছেলের বাড়িতে মেয়ের বাড়ির মেয়ের বাড়িতে ছেলের বাড়ির প্রশংসা এবং পণের টাকা ছেলে ও মেয়ের বাড়িতে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করে। সাজুর মায়ের কাছে দুই কুড়ি বলে এসে রূপাই এর মা'এর কাছে বলে আড়াই কুড়ি টাকা। ঘটকের এই রূপ কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। যেমন-

লম্ফে লম্ফে চলে ঘটক দম্ভ করে চায়,
লুটের মহল দখল করে চলছে যেন গাঁয়!
ঘটকালিরই টাকা যেন ঝন্-ঝনা-ঝন্ বাজে,
হন্ হনা হন্ চল্‌ল ঘটক একলা পথের মাঝে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৪১]

দুখাই ঘটকের চরিত্রের মতো কাব্যে আরো কয়েকটি খল চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে প্রধান হিসাবে বিবেচ্য বড়াই বুড়ি, খেঁদির মা, টুনির ফুফু এই শ্রেণীর গ্রাম্য চরিত্রগুলো অনেকাংশে পরিচিত টাইপ চরিত্রের সমস্থানীয় বলে গ্রহণ করা যায়। পল্লী গ্রামের অকর্মণ্য এক শ্রেণীর বয়স্কা নারী অখন্ড অবসরের কারণে তুচ্ছ বিষয়কে বড় করে দেখে ও তার ওপর প্রলেপ দিয়ে তিলকে তাল করে তোলে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের বড়াই চরিত্রের মতো এদের কুটনি বুড়ি বললেও ভুল

হবে না। জসীম উদ্‌দীনের এই সব চরিত্রের ওপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল বলে তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও তিনি তুলে ধরেছেন সুচারুভাবে। যেমন-

কানা-ঘুষা করত যারা রূপার স্বভাব নিয়ে,
ঘোর কলিকাল দেখে যাদের কানত সদা হিয়ে;
তারাই এখন বিয়ের কাজে ফিরছে সবার আগে,
ভাঙা-গড়ার সকল কাজেই তাদের সমান লাগে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৪৪]

প্রগাঢ় অনুভূতিসম্পন্ন শিল্পীর দৃষ্টিতে কাব্যের প্রতিটি চরিত্রের অনুপুঙ্খ দিক তুলে ধরেছেন। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র সাজুর মা কাব্যে স্বল্প পরিসরে তাঁর পদচারণা লক্ষ করা যায়। তাঁর বাড়িতে রূপাই এর ঘনঘন আনা-গোনার সময় মেয়ের প্রতি সাবধানতা অবলম্বনে রূপাইকে কড়া কথা শোনাতে দ্বিধা করেননি-

"শোন বাছা কই, লোকের মুখেতে এমন তেমন শুনি,
ঘরে আছে মোরে বাড়ন্ত মেয়ে জ্বলন্ত এ আগুনি।
তুমি বাপু আর এ বাড়ি এসো না। খালা বলে রোষে রোষে,
"কে কি বলে? তার ঘাড় ভেঙে দেব!" রূপা কহে দম কসে।
"ও-সবে আমার কাজ নাই বাপু, সোজা কথা ভালবাসি,
সারা গাঁয়ে আজ টি টি পড়ে গেছে, মেয়ে হল কুল-নাশী।"

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৩১]

নিজের মেয়ের যাতে অন্য কেউ কোন কুৎসা রটাতে না পারে সেজন্যে রূপাই এর প্রতি কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণে তিনি বিরত হননি। এখানে সাজুর মা এর চরিত্রের মধ্যে একটি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের সন্ধান মেলে। তবুও রূপাই-এর প্রতি তাঁর হৃদয়ের গভীর মমতার প্রমাণ পাওয়া যায় রূপাই-এর মায়ের পাঠানো ঘটককে সাদরে গ্রহণের

মধ্যে। দুখাই ঘটকের মাধ্যমে যখন সাজুর সঙ্গে রূপাই-এর বিয়ের প্রস্তাব আসে তখন তিনি কিছুমাত্র বিরোধিতা করেননি। এই চরিত্রের বিস্তৃত বিকাশ লক্ষ করা যায়। রূপাই এর ফেরারী অবস্থায় বিরহিনী সাজুকে যে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়েছেন তা অত্যন্ত জীবন্ত। যেমন-

মেয়ের এমন দশা দেখে মার সুখ নাই কোন মনে,
রূপারে তোমরা দেখেছো কি কেউ, শুধায় সে জনে জনে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৬৯]

চৈত্র মাসে পশ্চিম হতে লোকজন পসরা নিয়ে আসার পর শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধা মার আচরণে গভীরভাবে সন্তান বাৎসল্য প্রকাশিত হয়েছে।

সাজুর মায়ে যে ডাকিয়া তাদের বসায় বাড়ির কাছে,
তামাক খাইতে হুঁকো এনে দ্যায়, জিজ্ঞাসা করে পাছে;
"তোমরা কি কেউ রূপাই বলিয়া দেখেছ কোথায় কারে,
নিটল তাহার গঠন গাঠন, কথা কয় ভারে ভারে।"

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৬৯-৭০]

বৃদ্ধার আশা ভঙ্গ করতে বিদেশী চাষিদের কষ্ট হয় তাই তারাও তাকে মিথ্যে আশ্বাস দেয়। রূপাই এর মত একজনকে দেখেছে যে ভাদ্র মাসে আসবে। এই কথা শোনার পর সাজুর বৃদ্ধা মা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে মেয়েকে খবর দেয়-

মেয়েরে ডাকিয়া বারবার কহে "ভাবিস না মাগো আর,
বিদেশী চাষীরা কয়ে গেল মোরে-খবর পেয়েছে তার।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৭০]

সন্তানের দুঃখ কষ্ট এবং অসুস্থতায় মা-এর ব্যাকুল মন ও প্রাণের গভীর বেদনার চিত্র জসীম উদ্‌দীন চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

সোজন বাদিয়ার ঘাট

কবি জসীম উদ্‌দীনের প্রথম কাহিনী কাব্য 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' এর পরবর্তী অনবদ্য কাহিনী কাব্য 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' (১৯৯৩) ঘটনা বিন্যাসে পল্লীর হিন্দু-মুসলাম দুধর্মীয় মানুষের অন্তরঙ্গ বসবাস ও বিরোধকে কেন্দ্র করে রচিত। তাদের মধ্যে সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির অভাব নেই। সবাই নিজেদের আচার ও ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করে। এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ রোদে-পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে ফসল উৎপাদন করে। সবাই সবার বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছোট ছোট সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না নিয়ে তাদের প্রতিটি দিন কাটে উৎসবের মতো। কাব্যের বিষয়বস্তু গঠিত হয়েছে বিয়োগান্তক কাহিনী অবলম্বনে। গদাই নমুর আদরের মেয়ে দুলী ও ছমির শেখের পুত্র সোজন। তাদের দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে সখ্যতা। তারা শৈশব থেকে একে অপরের খেলার সাথী। পরবর্তী সময়ে তাদের দুজনের প্রেমের ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক কলহ। শিমুলতলী গ্রামে হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে থাকলে কুচক্রি জমিদারের স্বার্থ হাসিল হয় না তাই এদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীজ বপন করা হয়। ঘটনা পরিক্রমায় কবি দেখিয়েছেন হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতার চিত্র। মূল কাহিনী যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে সেই সোজন ও দুলী কৈশোরের খেলার সাথী থেকে যৌবনের অঙ্গনে পা দেয়। তাদের অনভিজ্ঞ মন জানে না যে অসম প্রেমের কি ভয়ংকর পরিণতি ঘটতে পারে। শিমুলতলী গাঁয়ে সামান্য লাঠি খেলাকে কেন্দ্র করে সাউদ পাড়ায় খাঁ-রা ও ভাজনপুরের শেখরা নমুদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। যার ফলে নমুরা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে। নিজ গ্রামের মুসলমানদের সঙ্গে যদিও শিমুলতলী মুসলিমদের মহররমের দাঙ্গায় কোন হাত ছিল না। শিমুলতলীর গ্রামের নমুদের

একই গাঁ-এর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার পেছনে ছিল রামনগরের নায়েব মশাই-এর হস্তক্ষেপ। প্রচণ্ড দাঙ্গার অবশ্যম্ভাবিতা অনুধাবন করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রাতের আঁধারে শিমুলতলী থেকে পালিয়ে যায়। কুচক্রি নায়েবের উক্তিতেই ধরা পড়ে তার হীন মানসিকতা-

কত বড় বুকের পাটা জমিদারের হুকুম ঠেলে,
শিমুলতলী গাঁয়ের পরে আজো হেসে ফিরছে খেলে!
দেখে নেব, দেখেই নেব, দেওয়ানী কোর্ট খুলুক আগে;
ডিগ্রীজারী আনব ডেকে, দেখবি তখন কেমন লাগে।
নেড়ের সাথে মিলছে চাঁড়াল, বেশী কিছু বল্লে পরে,
ভাল মন্দ অনেক কিছুই ঘটতে পারে কপাল জোড়ে।
সাপ নিয়ে ত খেলছে খেলা, ভালই জানেন নায়েব মশাই,
অনেক ছলা, অনেক কলার জাল টেনে তাই ফেরেন সদাই।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ৩৯]

নায়েবের চক্রান্ত প্রথমে বিফলে যায় কারণ গদাই নমুর বিবেকের তাড়নায় শেষে ভয়ঙ্কর আত্মঘাতি হামলা থেকে তারা পিছিয়ে যায়। যেমন-

"ফিরিয়া দাঁড়াও," গদাই মোড়ল ঘোষিল উচ্চে সামনে আসি,
"নতুবা আমার বুকের রক্তে মেটাও এ ক্ষুধা সর্বগ্রাসী।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ৫৪]

সাম্প্রদায়িক বিবাদ হয়ত শেষ হতো কিন্তু সোজন দুলীর পালিয়ে যাওয়া তা জলন্ত আগুনে ঘি দেওয়ার মত ঘটে। দুলী বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে আকাশ-বাতাস, চন্দ্র-সূর্যকে স্বাক্ষ্য রেখে সোজনকে স্বামী হিসাবে বরণ করে।

এদিকে নমুর বংশে কালিমা এঁকে দেওয়ার কারণে ক্ষিপ্ত নমুরা কাজী চকে মুসলমানদের ওপর অতর্কিত হামলা করে। নায়েব প্রথম বার স্বার্থ উদ্ধারে ব্যর্থ হলেও ওঁৎ পেতে ছিল সুযোগের জন্য। পরবর্তী সময়ে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দুপক্ষে সংঘাত বাধিয়ে দেয়। সংঘাত-পূর্বে কাজীর গ্রামে ছিল মিলাদ। আক্রান্ত হয়ে তারাও ক্ষিপ্র গতিতে আক্রমণ করে প্রতিপক্ষকে। এই আত্মঘাতী সংঘাতের ইন্ধন দাতা রামনগরের নায়েব-এর বিষয়টি জসীম উদ্‌দীন বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এঁকেছেন। সোজন দুলী পালিয়ে গড়াই নদীর তীরে দুজনে সুখের ঘর বাঁধে। দুলীর বারণ সত্ত্বেও বেশি উপার্জনের আশায় ও ভবিষ্যৎ চিন্তায় বেপারীর নায়ে সোজনের কাজ করা ও পরে পুলিশের হাতে ধরা পড়া। নায়েবের চক্রান্তে নারীহরণের মামলায় সোজনের সাত বছর কারাবাস হয়। এই নায়েবই দুলীর অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা করে। আত্মঘাতী সংঘাতে লিপ্ত গদাই নমু ও ছমির শেখ পরবর্তীকালে সর্বস্বান্ত হয়ে নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে এই সংঘর্ষের মূল নায়ক রামনগরের নায়েবের প্রতি চরম প্রতিশোধে অগ্রসর হয়-

পরের দিন সকালবেলা দেখল পথিক জন,
এপার বিলের কবর বাঁধা ওপার চিতা কোন!

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১২০]

রাম নগরের নায়েব এর কোথাও খোঁজ মেলে না এবং কিছু দিন পরে দেখা গেল-

খবর–খবর–কিসের খবর–গুজব শুনি গাঁয়,
রামনগরের নায়েব মশার খোঁজ না পাওয়া যায়।
কদিন পরে দেখল সবে বিলের ধারে খুঁড়ে,
নায়েম মশার আধেক দেহ ঘুমিয়ে কবর জুড়ে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১২০]

কুচক্রি নায়েবের প্রতি চরম প্রতিশোধ নিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে আবার সম্প্রীতির বাঁধনে বেঁধে রাখে। সাত বছর জেল খাটার পর সোজনের বেদের বহর করে দেশান্তরিত হওয়া, দুলীর সন্ধান ও উড়ান খালীতে দুলীর সঙ্গে সোজনের নাটকীয় সাক্ষাৎ হয়। বিবাহিত দুলীর দ্বারা সোজন প্রত্যাখ্যাত হয়। প্রত্যাখ্যাত হয়ে সোজনের বিষপান ও তার বিরহী হৃদয়ের করুণ মর্মবাণী বাঁশির সুরে ধ্বনিত হয়। বাল্য প্রেমিকের বিষপানে আত্মাহুতির ঘটনা সহ্য করতে না পেরে দুলী আত্মবিসর্জন দেয়। ঘটনাটি পরবর্তী সময়ে কিংবদন্তী হয়ে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয় ও যে ঘাটে তাদের দেহ থেকে প্রাণ পাখি উড়াল দেয় সেই ঘাটের নাম 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' নামে লোক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

সাধারণভাবে এই ঘটনা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট। প্রথমত, কাব্যের নায়ক কিশোর সোজন ও নায়িকা কিশোরী দুলীর প্রেম, বিবাহ ও বিয়োগান্ত পরিণতি। দ্বিতীয়ত, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব। একটি কাব্যের মূল কাহিনীটি অপরটি এর সহকারী বা উপকাহিনী। জসীম উদ্‌দীনের প্রথম কাহিনী কাব্য 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' এর ন্যায় তাঁর দ্বিতীয় কাহিনী কাব্য 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'-এর বিষয়বস্তুও পল্লীকেন্দ্রিক অর্থাৎ পল্লীর সহজ লভ্য উপাদন দিয়ে সৃষ্টি। পল্লীর পথ-ঘাট, বেথুল ঝাড়, রায়ের দিঘি, বিল, পাখির বাচ্চা-সবই পল্লীর একান্ত আদরের বস্তু। তাঁর দুটি কাহিনী কাব্যই পল্লীর বিষয়বস্তু নিয়ে গ্রন্থিত কিন্তু উপস্থাপনের রূপ স্বতন্ত্র। জসীম উদ্‌দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাব্য একই সমাজের অর্থাৎ মুসলান পরিবারের নর-নারীর প্রেম, কৃষক-কৃষাণীর ভালবাসা, ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সহজ-সরল গতিধারার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কবির শিল্পিত রূপ। সোজন বাদিয়ার ঘাট কাব্যে জীবন-বীক্ষা জটিল ও ব্যতিক্রম ধারায় প্রবাহিত।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট'-এর কাহিনী নক্সী-কাঁথার মাঠের তুলনায় খানিকটা স্বতন্ত্র। এখানে দুটি ভিন্ন সমাজ ও সম্প্রদায়ের নর-নারীর প্রেম চিত্রিত। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব। সোজন-দুলীর শৈশবের অন্তরঙ্গতা থেকেই এক অশুভ লক্ষণ, বিচ্ছেদের সুর ধ্বনিত হয়। যা কাব্যের নায়ক সোজন উপলব্ধি করেছে। যেমন-

তখনো কঠোর আজান ধ্বনিছে, সাবধান, সাবধান!
ভয়াল বিশাল প্রলয় বুঝিবা নিকটেতে আগুয়ান।
ওরে ঘুমন্ত-ওরে নিদ্রিত-ঘুমের বসন খোল,
ডাকাত আসিয়া ঘিরিয়াছে তোর বসত-বাড়ির টোল।
শয়ন–ঘরেতে বাসা বাঁধিয়াছে যত না সিঁধেল চোরে,
কণ্ঠ হতে গজমতি হার নিয়ে যাবে চুরি করে।
শয়ন হইতে জাগিল সোজন, মনে হইতেছে তার,
কোন্ অপরাধ করিয়াছে যেন জানে না সে সমাচার।
চাহিয়া দেখিল, চালের বাতায় ফেটেছে বাঁশের বাঁশী,
ইঁদুর আসিয়া থলি কেটে তার ছড়ায়েছে কড়ি রাশি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৮]

এই বিচ্ছেদের আশু সম্ভাবনায় সোজন বিচলিত হয়েছে কোন অঘটনের কথা চিন্তা করে কিন্তু তার স্বরূপ সে উপলব্ধি করতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে এই বিচ্ছেদের সুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মধ্য দিয়ে বাস্তব রূপ লাভ করে। যার ফলে সোজন-দুলীর প্রেম মিলনে নয় বিরহে রূপ পায়। আর 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্য ট্রাজেডিতে পর্যবসিত হয়। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যে সমাজ এমন বিরূপ শক্তি হিসেবে তাদের

সামনে উপস্থিত হয়নি তবু এটিও ট্রাজেডি কাব্য কারণ, কাব্যের শেষ পর্যায়ে রূপাই-সাজুর করুণ-মৃত্যু পাঠককে বেদনঘন করে তোলে। দুটি কাব্যই ট্রাজেডি কিন্তু এর প্রকৃতি ভিন্ন। দুটি কাব্যেই নায়ক-নায়িকা অকালে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় তৃষ্ণার্ত হৃদয় নিয়ে। উভয় কাব্যেই নায়ক-নায়িকা শেষ পর্যন্ত প্রেমে বিশ্বস্ত থেকেছে। নক্সী কাঁথাতে সাজু বা রূপাই চরিত্রে কোন দ্বন্দ্ব নেই তবে সোজন বাদিয়ার ঘাটে দুলীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সাময়িকভাবে সোজন- এর অর্ন্তদ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। অন্যদিকে দুলীও সাময়িক ভাবে নিজের স্বামী সংসার না সোজন এই দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হলেও পরবর্তী সময়ে পূর্ব-প্রেমই প্রাধান্য লাভ করে। গাজনার চর দখল নিয়ে দ্বন্দ্বে রূপাই ফেরারী হলেও তাদের প্রতি সামাজিক দিক থেকে কোন বাধা আসেনি। কিন্তু অসম প্রেম সমাজ বহির্ভূত। তাই 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে সমাজের রক্ত চক্ষু প্রতিনিয়তই ক্ষত-বিক্ষত করেছে সোজন-দুলীর প্রেমকে। মূলত 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যে মানুষ নিয়তির হাতের ক্রীড়নক আর সোজন বাদিয়াতে মানুষ সমাজের হাতের ক্রীড়নক। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যের মত এ কাব্যেও জসীম উদ্‌দীন গ্রাম্য গীত, ছড়া ব্যবহার করেছেন। অধ্যায়ের শুরুতেই রয়েছে-

"যাদু! এ তো বড় রঙ্গ, যাদু! এ তো বড় রঙ্গ,
চার কালো দেখাতে পারো, যাবো তোমার সঙ্গ।"
"কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ,
তাহার অধিক কালো, কন্যে তোমার মাথার কেশ।"

[ছেলে ভুলানো ছড়া,
সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ০১]

আবার গ্রাম্য গীত-

নানান বরণ গাভীরে ভাই একই বরণ দুধ।
জগৎ ভরমিয়া দেখলাম একই মায়ের পুত।

[গাজীর গান
সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৫]

চার অধ্যায়ের শুরুতে মুর্শিদা গান রয়েছে। যেমন-

দুবুলার শীষে যেমন নিহারের পানি,
কোন জনা বেইমানে কইছে এই দেহ হাপনি।
বড় ঘর বান্দ্যাছাও মনা-ভাই, বড় করছ আশা,
রজনী প্রভাতের কালে পঙ্খি ছাড়বে বাসা।

[মুর্শিদী গান,
সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৬]

এভাবে প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে ছড়া ও গ্রাম্য গীতি লক্ষ করা যায়। জসীম উদ্‌দীনের হাতে পল্লীর নিতান্ত সহজলভ্য বিষয়গুলি কাব্যে বিশেষ হয়ে উঠেছে। তাঁর এই সাধারণকে বিশেষ করার যে দক্ষতা তুলনাহীন।

ধর্মীয় বন্ধনকে অতিক্রম করে যে প্রেম-বিবাহ তা সমাজ স্বীকৃত নয়, এই বিষয়টি সোজন-দুলী মানতে চায়নি বলে এই অসম প্রেম সমাজ প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়ে আঘাত পেয়েছে, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে দুটি হৃদয়। কৈশোরের শেষে যৌবনের প্রথম বেলা থেকেই দুলীর সহজ-সরল নারী হৃদয় সোজনকে ছাড়া কিছুই বুঝতে চায়নি।

নারী হৃদয়ের এই একান্ত অনুভূতি জসীম উদ্‌দীন সাবলীলভাবে উপস্থাপন করেছেন। কবির ভাষায়-

দুলালী সে যেন বনের হরিণী, সোজন তাহার বন,
লতা পাতা ফুল ছায়া বিছাইয়া হরণ করিছে মন।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা ৯]

দুলীর মন খুশিতে নেচে ওঠে সোজনের সাথে দেখা হলে-

সোজনের সাথে তার ভারি ভাব, পথে যদি দেখা হয়,
যেন রাঙা ঘুড়ি আকাশে উড়াল, হেন তার মনে লয়।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা ৯]

দুলীর হৃদয়ে সোজনের প্রতি গভীর ভালবাসা উপলব্ধি করা যায় নিচের চরণগুলি থেকে-

সোজনের সাথে তার ভারি ভাব, দুলীর ইচ্ছে করে
সোজনেরে সে যে লুকাইয়া রাখে সিঁদুর কৌটো ভরে।
আঁচল খানিরে টানিয়া টানিয়া বড় যদি করা যেত,
সোজনেরে সে যে লুকায়ে রাখিত কেউ নাহি খুঁজে পেত।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট-পৃষ্ঠা: ১০]

অর্থাৎ গ্রাম্য এই পল্লীবালার প্রেমাস্পদ যেন কিছুতেই হাতছাড়া না হয়। সোজনেরও তেমনি আকুতি তার বাল্য-প্রেয়সী দুলীর জন্যে। তাই কৃষকের ছেলের ভালবাসার মধ্যে জেগে উঠে কৃষি উপাদান-

পাট মেরে সে যে নিড়াইয়া দিবে বউ-টুবানীর চারা,
খেত ভরি হবে ফুলের বাহার দুলীর খুশির পারা।
বাড়ির পালানে কুমড়া লাগাবে নহে কুমড়ার তরে,
কুমড়ার ফুল ভালবেসে দুলী যদিবা খোঁপায় পড়ে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা ১৫]

অন্যের খেতে শাক তুলতে গেলে গালি দেয় তাই সোজন দুলীর জন্য মাঘী মটরের চাষ করবে। যেমন-

বাছাই করিয়া করিবে সোজন মাঘী মটরের চাষ,
শাক তুলে তুলে সেদিন দুলীর পুরিবে মনের আশ।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা ১৫]

দুলীর জন্য অসাধ্য কিছু নেই প্রেমের প্রতি গভীর বিশ্বস্ততার কারণে। যেমন-

জমিরের খেতে ছাই মিঠে আলু দেখো সোজনের খেতে,
শাকের মামুদ আলু হবে কেউ হেরেনি যা চক্ষেতে।
দুলীর সঙ্গে তার ভারি ভাব, দুলীর খুশীর তরে,
হেন কাজ নাই যাহা কোনদিন সোজন না পারে করে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা ১৫]

এখানে দেখা যায় পল্লী কৃষকের ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী, ফসল ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন কবি। বিষয়বস্তু পল্লীকেন্দ্রিক হলেও তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে ভালোবাসার সার্বজনীন রূপ। কাহিনীর ভেতর দেখা যায় সোজন দুলী বাল্যে খেলার সাথী থেকে যৌবনে দুলী সোজনের ঘরের গৃহিণীর স্থান অধিকার করেছে। নর-নারীর অসম প্রেম, বিবাহ-

বিচ্ছেদ, বিরহ জসীম উদ্‌দীন বাস্তবরূপে চিত্রিত করেছেন। আবার সামান্য লাঠি খেলাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের ওপর নমুদের আক্রমণের প্রস্তুতি ও আসন্ন আক্রমণের বার্তা শুনে সংখ্যালঘু মুসলমান কাজির চকে পালিয়ে যায়, এই সাম্প্রদায়িক বিবাদ ও কাহিনীকে রসঘন করে তোলে।

আক্রমণের প্রস্তুতির যে ভয়াবহতা তার চিত্র নিচের চরণগুলি থেকে অনুধাবন করা যায়-

উল্লাস ভরে নাচে নমুদল, মশালের পর মশাল জ্বালি,
খড়্গ ঘুরায়ে, সরকী ঘুরায়ে ডাক ছেড়ে চলে হাজার ঢালী।
চলে তারা চলে বাঙড়ের পথে চরণে মথিত মেদিনী মাটি,
হাতে উলঙ্গ আগুন নাচিছে, কালো মশালের ধরিয়া ডাটি।
রহিয়া রহিয়া গরজিয়া উঠে, তরঙ্গ তার ধরণী ঘুরি,
গগনে গগনে জাগায়াছে ত্রাস বিদ্যুদ্দাম মেঘেতে ছুঁড়ি।
আজকে তাহারা হাতে পাইয়াছে পিনাকপাণির ত্রিশূল খান,
সুরাসুর নর যে আসিবে পথে, আজকে কাহারো নাহি ত্রাণ।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা ৫৩]

তবে শেষ পর্যায়ে ভয়ঙ্কর আত্মঘাতী সংঘর্ষ হতে নমুরা নিজেদের ফিরিয়ে এনেছিল গদাই মোড়লের শুভ বুদ্ধি উদয়ের ফলে-

পিছন হইতে মোড়ল ডাকিল, "ফিরিয়া দাঁড়াও সকল ভাই,
কি কাজ মারিয়া মুসলমানেরে, চল মোরা ঘরে চলিয়া যাই।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট-পৃষ্ঠা: ৫৩]

প্রথমে নমুর দল প্রতিপক্ষকে আক্রমণ থেকে বিরত হতে না চাইলে পরে গদাই নমু তাদের কুচক্রি জমিদারের চাল বোঝাতে সক্ষম হয়। একদিকে আক্রমণের ভয়ঙ্কর প্রস্তুতি অন্যদিকে ভীত মুসলমানদের গ্রাম ত্যাগের উদ্যোগে সকরুণ মনোভাব লক্ষ করা যায়। যেমন-

ঘর-বাড়ি সব পড়িয়া রয়েছে; ঘরের মানুষ
পলাইয়া গেছে নাজানি কিসের তরে,
পীরের দরগা শূন্য আজিকে, বিড়াল-কুকুর
ফিরিতেছে সেথা আপন ইচ্ছেভরে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা ৫৮]

মসজিদের ঘরে যেখানে আজান হত আজ সেখানে ষাঁড় মাটি খুড়ছে-
মসজিদে সবে আজান হাঁকিয়া মুসলমানেরা
প্রভাত না হতে নামাজে হইত খাড়া,
সেখানে আজিকে গোটা দুই ষাঁড় মাটি খুঁড়িতেছে
আপনার মনে শিঙে শিঙে দিয়ে ঝাড়া।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা ৫৮]

ঘরের রমণীরা পাটা সমেত হলুদ ও মেহেদীর পাতা ফেলে চলে যাওয়ার করুণ দৃশ্য কবির ভাষায়-

হলুদের পাটা পড়িয়া রয়েছে, আধেক হল্‌দী
বাটিয়া কোথায় বাটুনী গিয়াছে চলি,
কালকের তোলা মেহেদীর পাতা সাজিতে রয়েছে,
ছেঁচিয়া কেহই লয়নি চরণে ডলি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট-পৃষ্ঠা: ৫৮]

মুসলমানদের গ্রাম ত্যাগে গ্রামের প্রতিটি জিনিসে বেদনার ছাপ-

সিঁদুর কৌটা লুটায় মাটিতে, সকিনার সেই
বিবাহের জাত ধুলায় পড়িয়া আছে,
মদীনা সখীর খোপ-কবুতর এ ডালে ও ডালে
ডাকিয়া ডাকিয়া কাঁদিছে শিমুল ডালে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা ৫৮]

এই বেদনা আরও ঘনীভূত হয় যেমন-

ময়নামতির উঠান ঘিরিয়া লহর খেলিছে পূবাল বাতাসে
হেলায় দুলিয়া লাল নৈটার শাক,
মুন্সীবাড়ির মৌলবী কচু পাতায় মেলিয়া
রঙিন আঁখরে কাহারে পাড়িছে ডাক।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ৫৯]

মুসলমানদের গ্রাম থেকে চলে যাবার পর কিছু দিন অতিক্রান্ত হলে অবস্থা স্বাভাবিক হওয়ার পর সবাই ঘটনা আস্তে আস্তে ভুলে যেতে থাকে কিন্তু দুলী সোজনের ঘটনা তাদের হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে রাখে। তাদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে। এর পিছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন রাম নগরের নায়েব। অসম প্রেম সমাজ মেনে নেয়নি তাই তাদের জীবনে নেমে এসেছে ঘোর কালো অন্ধকার। বিয়ের আসর থেকে প্রেমাকর্ষণে দুলী পালিয়ে যায় সোজনের হাত ধরে, পালিয়ে গেলেও তাদের মিলন ছিল ক্ষণস্থায়ী। তাদের অল্পস্থায়ী জীবন ছিল সুখ ও আনন্দে পূর্ণ। কাব্যে এই দিকটি নিম্নোক্তভাবে চিত্রিত হয়েছে-

গড়াই নদীর তীরে,
কুটীরখানিরে লতাপাতা ফুল মায়ায় রয়েছে ঘিরে।
বাতাসে হেলিয়া, আলোতে খেলিয়া সন্ধ্যা সকালে ফুটি,
উঠানের কোণে বুনো ফুলগুলি হেসে হয় কুটি কুটি।

মাচানের পরে সিম-লতা আর লাউ-কুমড়ার ঝাড়,
আড়া-আড়ি করি দোলায় দোলায় ফুল ফল যত যার।
তল দিয়ে তার লাল নটে শাক মেলিছে রঙের ঢেউ,
লাল শাড়িখানি রোদে দিয়ে গেছে এ বাড়ির বধূ কেউ।
মাঝে মাঝে সেথা এঁদো ডোবা হতে ছোট ছোট ছানা লয়ে,
ডাহুক মেয়েরা বেড়াইতে আসে গানে গানে কথা কয়ে।
মটরের ডাল, মসুরের ডাল, কালিজিরা আর ধনে,
লঙ্কা-মরিচ রোদে শুকাইছে উঠানেতে সযতনে।
লঙ্কার রঙ, মসুরের রঙ মটরের রঙ আর,
জিরা ও ধনের রঙের পাশেতে আলপনা আঁকা কার!
যেন একখানি সুখের কাহিনী নানান আখরে ভরি,
এ বাড়ির যত আনন্দ হাসি আঁকা জীবন্ত করি।
সাঁঝ-সকালের রঙিন মেঘেরা এখানে বেড়াতে এসে,
কিছুখণ যেন থামিয়া রয়েছে এ বাড়িরে ভালবেসে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ৯৪]

কবির লেখনিতে প্রকৃতির ফুল, লতা-পাতা, মেঘ ও কৃষি দ্রব্যাদি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। সোজন দুলীর পালানোকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম যে দাঙ্গায় লিপ্ত হয় পরবর্তী সময়ে তা আরো তিক্তরূপ লাভ করে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে হিন্দু-মুসলিম দুই পক্ষেরই বিরাট বিপর্যয় ঘটে। আত্মঘাতি হামলায় ক্ষতি হয় তাদের নিজেদেরই। এই কলহ পরোক্ষভাবে ইন্ধন দেয় রাম নগরের নায়েব। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সোজনের সাত বছরের জেল হয় আর দুলীরও বিয়ে হয়ে যায় অন্যত্র। এখান থেকেই শুরু হয় দুজনের মধ্যে বিরহ। জসীম উদ্‌দীন এই কাব্যে করুণ ও ভয়ঙ্করের চিত্র সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। দাঙ্গার চিত্র যেমন হৃদয়ে ভয়ের

উদ্রেক করে তেমনি সোজন দুলীর বিরহ তাপিত হৃদয়ের যে রক্তক্ষরণ তা উপলব্ধি করে পাঠক হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। নারী হৃদয়ে আঘাতের জর্জরিত রূপ জসীম উদ্‌দীন অত্যন্ত দরদ দিয়ে এঁকেছেন। অন্যের ঘরে দুলী হাজার চেষ্টা করেও সোজনকে ভুলতে পারে না। সোজনের স্মৃতি, গড়াই নদীর তীরে সুখের কুটির, সমাজ ধর্মের দিক থেকে বিষয়টি অননুমোদিত হলেও হৃদয়ের বাঁধন তো কোন কিছু দিয়ে বেঁধে রাখা যায়নি। দুলীর প্রশ্ন সৃষ্টিকর্তার কাছে-

কি দোষ পাইয়া নিদারুণ বিধি
দুলীর কপালে লিখিলে এমন লেখা,
তুমি কি কখনো এমন বেদনা
পেয়েছ জীবনে শুধাতাম পেলে দেখা।
বন-হরিণীরে বধিলে পরাণে
নিদারুণ ব্যাধ! সে বিষের হানি শর,
তুমি কি জেনেছ সে বিষ-ব্যথায়
কি করিয়া কাঁদে হরিণীর অন্তর?
তুমি ত গড়েছ নানা জাত ভবে
গড়িয়াছ সেথা সমাজের ব্যবধান,
কেন এ মনের নাহি জাতিভেদ
একের লাগিয়া কাঁদে অপরের প্রাণ?

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ১৩২]

স্মৃতি সবসময় অগোচরে কাজ করে যায় দুলীর প্রতি মুহূর্তের অর্ন্তজ্বালা কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে–

তবু সে অতীত–দুখের অতীত,
পথে যেতে যেতে বারে বারে ফিরে চায়,
জীবনের শত হাসি গান যেন
কার ছোঁয়া লাগি কিসের কি হইয়া যায়।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৩০]

দুলীর হৃদয়ের অন্তক্ষরণ যেমন কবি দেখিয়েছেন তেমনি আর এক বিরহী হৃদয় সোজন যে সাতটি বছর জেলের অন্ধকার ঘরে কাটিয়ে প্রেয়সী দুলীর খোঁজে বাদিয়ার দলে ভিড়ে দেশে দেশে ঘুরে তার অনুসন্ধান করেছে তাও দেখিয়েছেন। অবশেষে তাদের সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু তা আরো দুর্ভোগ ঘটায় তাদের জীবনে। দুলী স্বামীর মান সম্মানের কথা চিন্তা করে সোজনকে প্রত্যাখ্যান করে। দুলীর কাছে প্রত্যাখ্যাত সোজন হৃদয়ের জ্বালা মেটাতে বিষলক্ষের বড়ি খেয়ে বাঁশিতে করুণ সুর তোলে। দুলী সেই সুরে সব কিছু ভুলে স্বামী, ঘর, সংসার ছেড়ে প্রেমের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যায় নদীর ঘাটে। তার মনের ভালবাসার প্রতি চিরদিনের ঘোষণা কবির ভাষায় গভীর ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত হয়–

"আজো দুলী তার সোজনেরে ছাড়া আর কাহারেও নাহি জানে,
সোজন তাহার ঘরে ও বাহিরে দেহে মনে আর প্রাণে।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৫৮]

তার এই ঘোষণা থেকে বোঝা যায় অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেলেও তার প্রতিটি রন্ধ্রে মিশে ছিল সোজন। আর সোজনের রন্ধ্রে যে দুলী মিশে ছিল তা বিষলক্ষের বড়ি খেয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছে। দুলী, সোজনের এই চলে

যাওয়া সহ্য করতে না পেরে নিজেও মৃত্যুকে বরণ করে। পার্থিব জীবনে মিলিত না হতে পারলেও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তারা অপার্থিব জীবনে সঙ্গি হতে চেয়েছে। জসীম উদ্‌দীন এই ভিন্ন সম্প্রদায়ের নর-নারীর প্রেম সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলেও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদের মিলন দেখিয়েছেন। আর সোজন দুলীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যে করুণ পরিণতি তা যেন প্রত্যেক বিরহী-বিরহিনীর হৃদয়ের ক্ষত। তা পাঠককে শোকার্ত করে তোলে ট্র্যাজিক পরিবেশের মাধ্যমে, এখানেই কবি জসীম উদ্‌দীন কাহিনীর রূপকার হিসাবে সার্থক। প্রথম কাহিনী কাব্যের সাথে বিষয়বস্তু ও কাহিনীতে কিছুটা মিল থাকলেও বর্তমান কাব্যের আকার বর্ণনা, স্বতন্ত্র ও উপস্থাপনায় ভিন্নতা লক্ষণীয়। পল্লীর মানুষ ও বিষয়বস্তু জসীম উদ্‌দীনের হাতে হয়ে উঠেছে কাব্যরসে পরিপূর্ণ জীবনবোধের অপূর্ব আলেখ্য। অসম-ধর্মীয় বন্ধনকে অতিক্রম করে সোজন বাদিয়ার ঘাটের নায়ক-নায়িকা তাদের জীবনের যে চরম দুর্গতি ডেকে এনেছে তাই কাব্যটিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যের চেয়ে এর পর্ব সংখ্যাও বেশী। তাই এ কাব্যে কাহিনীর বিস্তৃতি লক্ষ করার মত। চরিত্র চিত্রনেও জসীম উদ্‌দীনের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। সোজন-দুলী গদাই নমু, মুন্সী সাহেব, নায়েব প্রতিটি চরিত্র স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল। নায়িকা দুলীর দৈহিক লাবণ্য প্রকৃতির কোমলতার মাধ্যমে নির্দেশিত হয়েছে–

ইতল বেতল ফুলের বনে ফুল ঝুর ঝুর করেরে ভাই,
ফুল ঝুর ঝুর করে;
দেখে এলাম কালো-মেয়ে গদাই নমুর ঘরে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১]

তার গায়ের রং যেন শ্যামল বনানীরই রূপান্তর তাই কবি বলেছেন-

ধানের আগায় ধানের ছড়া, তাহার পরে টিয়া,

নমুর মেয়ের গায়ের ঝলক সেইনা রঙ নিয়া।
দূর্বাবনে রাখলে তারে দূর্বাতে যায় মিশে,
মেঘের খাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১]

দুলীর গহনার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহরূপের প্রতিটি দিকের সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়েছেন কবি-

গায়ে তাহার গয়না নাহি, হাতে কাঁচের চুড়ি;
দুই পায়েতে কাঁসার খাড়ু, বাজছে ঘুরি ঘুরি।
এতেই তারে মানিয়েছে যা তুলনা নেই তার;
যে দেখে সে অমনি বলে, দেখে লই আরবার।
সোনা রূপার গয়না তাহার পরিয়ে দিলে গায়,
বাড়ত না রূপ, অপমানই করতে হত তায়।
ছিপ্‌ছিপে তার পাতলা গঠন, হাত-চোখ-মুখ-কান,
হেলছে দুলছে মেলছে গায়ে গয়না শতখান।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ২]

তার সারাদিন কাটে পুতুল বিয়ে দেওয়া, ভোরে ঝরা ফুল কুড়ানো, মালা গাঁথা আর সারা গ্রাম ঘুরে বেড়ানোতে। যেমন-

বেথুল তুলে, ফুল কুড়িয়ে, ভেঙ্গে ফলের ডাল,
সারাটি গাঁও টহল দিয়ে কাটে তাহার কাল।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ২]

তার প্রতিটি খেলার সঙ্গী হিসেবে সোজনের জুড়ি নেই-

এসব কাজে সোজন তাহার সবার চেয়ে সেরা,
ছমির শেখের ভাজন বেটা, বাব্‌রী মাথায় ঘেরা।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ২]

জসীম উদ্‌দীন দুলী চরিত্রের যে দিকটি বিশেষ করে তুলে ধরেছেন তা হলো সোজনের প্রতি তার দুর্বলতা। যেমন-

সোজন যেন বা তটিনীর কুল, দুলানী নদীর পানি,
জোয়ারে ফুলিয়া ঢেউ আছাড়িয়া করে কুল টানাটানি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৯]

সোজনের সাথে একদিন দুলীর দেখা না হলে তার চারদিক অন্ধকার হয়ে আসে। তাইতো সোজনের একবার অসুখ করলে দুলী বিচলিত হয়ে মানত করে-

সোজন না এলে দুলীর সেদিন চারিদিক আন্ধার;
পুতুল তাহার ভেঙে যায় যেন চরণের ঘায়ে কার।
সেই ত সেবার অসুখ করিল দুলী উঠে খুব ভোরে,
সাতটা মহিষ মানিয়া আসিল রক্ষাকালীর দোরে।
একুশ বামুন খাওয়াইবে দুলী সোজন সারিলে পর,
দুশো মোমবাতি মানিয়া আসিল জেন্দা পীরের ঘর।
সোজন যেদিন সারিয়া উঠিল, কি খুশী দুলীর মনে,
খেজুরের আঁটী যত ছিল জমা বিলাইল জনে জনে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১০]

এরপর সোজন সুস্থ হয়ে উঠলে খুশিতে তার প্রাণ নেচে ওঠে। যেমন-

সেদিন তাহার মনে এত খুশী, সে খুশীর সরোবরে,
কালী-মাতা তার সাতটি মহিষ হারাইল অকাতরে।
একুশ বামুন ভোজন ছাড়িল, জেন্দা না বলে পীর,
আদায় করিতে পারিল না দাম দুশটি মোমবাতির।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ১১]

শৈশব থেকেই সোজনের প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ। সাত সকালে সোজনের সাথে ফুল-ফল কুড়ানোর লোভ সামলাতে না পেরে দুলী তার মায়ের কাছেও কম ভৎর্সনা সহ্য করেনি। একদিন ভোরে সোজনের ডাকে সে দ্রুত বেরিয়ে আসতেই তার মা বলে উঠে-

সাতটা শকুনে খেয়ে না কুলোয় আধেক বয়সী মাগী,
পাড়ায় ধাঙড় ছেলেদের সনে আছেন খেলায় লাগি!

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ১৯]

সোজনের সাথে এক অসতর্ক মুহূর্তে দুলী তার মায়ের সামনে ধরা পড়ে প্রহৃত হয়-

এই কথা বলে দুলালীরে সে যে কিল্ থাপ্পড় মারি,
টানিতে টানিতে বুনো পথ বেয়ে ছুটিল আপন বাড়ি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ২৪]

দুলী সোজনের জন্য নানা অত্যাচার, অবিচার সহ্য করেছে। বিয়ের আসর থেকে সে পালিয়ে যখন দূর বনের মধ্যে সোজনের সঙ্গে দেখা করে তখন দুলীর সে অভিব্যক্তির মধ্যে নিষ্ঠাবোধ প্রকাশিত। দুলীর যুক্তিতে শেষ পর্যন্ত সোজন তাকে

নিয়ে পালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে উল্লেখ্য যে সোজন দুলীকে ভালবাসলেও ভিন্নধর্মী বিয়ে সমাজ স্বীকৃত নয় তাই এর পরিণাম ভয়ঙ্কর ভেবে প্রথমে রাজি হয়নি। যেমন-

বিবাহের বধূ পালায়ে এসেছি, নমুরা আসিয়া
এখনি খুঁজিয়া পাবে,
তারপর তারা আমারে ঘিরিয়া অনেক কাহিনী
রটাবে নানান ভাবে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৭১]

অভিমানী দুলী সোজনের উদ্দেশ্যে বলে-

"সোঁতের শেহলা, ভেসে চলে যাই দেখা হয়েছিল
তোমার নদীর কুলে,
জীবনেতে আছে বহুসুখ হাসি, তার মাঝে তুমি
সে কথা যাইও ভুলে।"

সোজনকে সে তার স্বামী হিসেবে বরণ করে নেয় চন্দ্র-সূর্য স্বাক্ষী করে। যেমন-

"সাক্ষী থাকিও চন্দ্র-সূর্য, সাক্ষী থাকিও
হে বনের গাছপালা-
সোজন আমার, প্রাণের সোয়ামী, সোজন আমার
গলার ফুলের মালা।"

তার হৃদয়ের সবচেয়ে বড় কষ্ট সে সোজনের কাছ থেকে পেয়েছে। তাইতো দুলীকে বলতে শুনি-

"সাক্ষী থাকিও সিঁথার সিঁদুর, সাক্ষী থাকিও
হাতের দুগাছি শাঁখা,
সোজনের কাছ হইতে পেলাম এ জনমে আমি
সব চেয়ে বড় দাগা।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৭৩]

এত বড় স্বীকারোক্তি যে নারীর তাকে কোনো যুক্তিতে সোজন অস্বীকার করতে পারেনি। বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে সোজনের হাত ধরে গড়াই নদীর তীরে ক্ষণস্থায়ী সুখের নীড় রচনা করে। তবে এই ক্ষণস্থায়ী সুখ জীবনের ভেতর জসীম উদ্‌দীন দুলী চরিত্রের আরেকটি দিক উন্মোচন ঘটিয়েছেন আর তা হলো তার শিল্পবোধ। দুলী হলুদ-মরিচের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো দিয়ে মাটির কুটিরের উপর যেমন সুন্দর চিত্র অঙ্কন করতে পারে তেমনি নানা ফুলের সমন্বয়ে তৈরী করতে পারে নক্সী সিকা। যেমন-

মটরের ডাল, মসুরের ডাল, কালিজিরা আর ধনে,
লঙ্কামরিচ রোদে শুকাইছে উঠানেতে সযতনে।
লঙ্কার রঙ, মসুরের রঙ মটরের রঙ আর,
জিরা ও ধনের রঙের পাশেতে আল্পনা আঁকা কার!

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৯৩]

ফুলচাং, বেলী-কদম্ব ফুল ঝরি শিকা ইত্যাদি নানান ধরনের হস্তশিল্পে দুলী পারদর্শী-

একপাশে আছে ফুলচাং বাঁধা নানা কারুকাজ ভরা,
চাল ভাল কিবা ফুলচাং ভাল বলা যায়নাক ত্বরা।
তার সাথে বাঁধা কেলী-কদম্ব ফুল-ঝরি-শিকা আর,
আসমান-তারা শিকার রঙেতে সব রঙ মানে হার
শিকায় ঝুলানো চীনের বাসন, নানান রঙের শিশি,
বাতাসের সাথে হেলিছে দুলিছে রঙে রঙে দিবানিশি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৯৬]

আর একদিকে এই দুলী চরিত্রের ভেতর দিয়ে জসীম উদ্‌দীন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির চিত্র দেখিয়েছেন। যেমন-

এই আঁকিয়াছি দুর্গা 'ভবানী' গণেশ এঁকেছি এই!
একা গেঁয়ো ঘরে রাধা বসে আছে, কৃষ্ণত কাছে নেই।

হিন্দু ঘরের মেয়ে হয়েও তার মধ্যে মুসলিম ঐতিহ্যের দিকটিও সমানভাবে প্রস্ফুটিত-

"সব ত আঁকিলে," সোজন কহিল, "মুসলমানের পীর,
যদি রাগ করে? কিছু আঁক নাই তাঁহাদের কাহিনীর"
"চোখে কি তোমার ঢেলা ঢুকিয়াছে? চেয়ে দেখ এইধারে,
মক্কার ঘর দাঁড়ায়ে রয়েছে প্রণাম জানাও তারে।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১০১]

জসীম উদ্‌দীন দুলীর চরিত্রের ভেতর যেমন প্রচণ্ড আবেগ, ভালবাসা, উচ্ছলতার ও শিল্পবোধের বৈশিষ্ট্য উন্মোচন করেছেন তেমনি তার ভেতরের দ্বন্দ্বও স্পষ্ট করে তুলেছেন। বেদের বেশে সোজনের সঙ্গে তার যখন সাক্ষাৎ হয় তখন সোজনকে প্রত্যাখ্যান করলেও নিজেও প্রচন্ড মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে। তার ভেতর চলে অন্ত র্দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব একান্ত দুলীর নিজস্ব আর সেই জন্য যখন সোজন নদীর কুলে বাঁশি বাজিয়ে তাকে আহ্বান করে সে ব্যাকুল হয়ে যায় হতবিহ্বল হয়ে পড়ে করণীয় দিক চিন্তা করে। তার হৃদয়ের দো-টানা ভাব উপলব্ধি করা যায় নিচের লাইনগুলো থেকে-

নিঠুর সে বাঁশী মানে না বারণ, স্বামীর সুনাম তার,
বিত্তি বেসাত জোর করে দুলী মনে করে বার বার।
হায় সে বাঁশীর সুরের জোয়ারে সকল ভাসিয়া যায়,
অবলা বালিকা-ভগবান! তুমি শক্তি দাও গো তায়।
সুরের উপরে সুর ভেসে আসে সহস্র দিক ভরি,
সহস্র সুরে আজ যেন বাঁশী ফিরিছে তাহারে স্মরি।
সেই সুর যেন রশিতে বাঁধিয়া বিস্মৃত দেশ হতে,
ঘটনার পর ঘটনা টানিছে কালিয়-দহের সোঁতে।
না- না দুলী সব ভুলিয়া গিয়াছে; নারী সে যে অসহায়
মন যে তাহার খেলার পুতুল সমাজের হাতে হায়।
তবু তবু আজ সব মনে পড়ে ভগবান ভগবান।
তুমি ত জানিছ, কত সহিয়াছে তাহার বালিকা প্রাণ!

জসীম উদ্‌দীন দুলী চরিত্রের ভেতর দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে নারীর চাওয়া-পাওয়ার কোন মূল্য সমাজ দেয় না। তাকে সমাজের কিছু বাঁধা-ধরা রীতি মেনেই

চলতে হয়। জসীম উদ্‌দীন দুলীর ভেতর যেমন প্রচন্ড আকারে অর্ন্তদ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন তেমনি একটি সময় সব দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সমাজ, সংসার দূরে সরিয়ে সমাজ বহির্ভূত প্রেমকেই জয়যুক্ত করেছেন। দুলী শেষ পর্যায়ে সোজনের কাছে গিয়ে সোজনের পরিণতিকেই নিজের পরিণতিতে রূপান্তর ঘটায়। জসীম উদ্‌দীন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে, দুলী চরিত্রের প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। এই কাব্যের নায়িকা দুলীর চরিত্র নির্মাণে কবি সার্থক।

জসীম উদ্‌দীন 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের নায়িকা দুলীর চরিত্র যেমন বাস্তব অবয়বের মধ্য দিয়ে সুন্দরভাবে এঁকেছেন তেমনি এই কাব্যের নায়ক চরিত্র অঙ্কনেও তিনি সমনীতি অনুসরণ করেছেন। কাব্যের প্রথম দৃশ্যেই নায়ক ও নায়িকার বর্ণনার মাধ্যমে কাহিনীর উপস্থাপন করেছেন। সোজন ছমির শেখের ছেলে ও দুলীর ছোটবেলার খেলার সাথী। কৈশোরে দুলীর সঙ্গে নিত্য খেলায় মত্ত এই ছেলেটিও ভালবেসে ফেলে দুলীকে। সোজন চরিত্রের ভেতর কবি প্রধানত তিনটি দিকের উন্মোচন করেছেন বীরত্ব, দ্বন্দ্ব, প্রেম। এছাড়া সোজন বাঁশি বাজাতে ও ঘুড়ি উড়াতে সমান পারদর্শী-

সোজনের মত ছেলেই হয় না, তোমরা কি জান তার,
রাঙা ঘুড়িখানি তার চেয়ে ভাল পারে কেহ উড়াইবার!

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ১৩]

দুলীর জন্য যে সব রকমের কাজ করতে পারে। সে কৃষকের ছেলে তাই তার প্রেয়সী দুলীর খুশির জন্য তার ভাল লাগার সব কিছু যেন ফসলময় হয়ে ঘুরে বেড়ায় সে যখন অনেক বড় কৃষাণ হবে তখন দুলীর জন্য কুসুম ফুলের চাষ করবে, পাট মেরে বউ টুবানীর চারা করবে, বাছাই করে মাঘী মটরের চাষ করবে, শাকের মামুদ আলু চাষ করবে। অর্থাৎ সোজন তার বাল্য প্রণয়ীনির জন্য হেন কাজ নাই যা করতে

অক্ষম। এরপর যখন মহররমের মাস আসে তখন অতীতের বীরত্ব ও করুণ গাঁথা আবৃতিতে তার পারদর্শিতা কবি উপস্থাপন করেছেন। যেমন-

ছমুর পোলা সোজন, তারে আজকে মোরা আনবো ডাকি,
মহরমের করুণ গাথা শুনব তাহার কণ্ঠে রাখি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ২৬]

সোজনের বীরত্ব দেখা যায় যখন সে বহু পুরাতন লেঠেল মদন চাচাকে লাঠি খেলায় পরাজিত করে। যেমন-

ঘুড়ির সাথে ঘুড়ির সাথে কাটাকাটি লাগলো কি আজ,
সাপের সাথে বেজীর লড়াই-বাজের সাথে লড়ছে কি বাজ?
এক হাতি খেল, দুই হাতির খেল, তিন হাতি খেল করল সারা,
চার হাতি খেল খেলতে খেলতে সোজন লাঠিতে মারল ঝাড়া।
মদন মিঞা ঘুরিয়ে লাঠি যখন জোরে মারল বাড়ি,
ছোঁ মারিয়া সোজন তখন লাঠি তাহার ফেললো কাড়ি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৩২-৩৩]

মদন মিঞাকে পরাজিত করে সোজন লাঠির উত্তরাধিকারী হয়। সোজনের প্রতি মদন মিঞার উক্তি-

শিমুলতলী গাঁয়ের বাঁশে তৈরী যে এই হাতের লাঠি,
থাকতে হাতে দেখিস যেন হয় না বে-হাত ইহার মাটি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৩৩]

সোজন কাপুরুষ নয় তার আরেকটি প্রমাণ মেলে দুলী বিয়ের আসর থেকে পালিয়ে যখন সোজনের কাছে আসে তখন লোক-লজ্জা-সমাজ-ধর্ম, নিজ গ্রাম, সব কিছুকে তুচ্ছ করে সে দুলীকে নিয়েই পালিয়ে যায়। নমুদের ক্ষিপ্ত রোষাণলে দুলীকে ফেলে যায়নি।

সোজন চরিত্রের আর এক উল্লেখযোগ্য দিক হলো তার প্রেমিকরূপ। সে প্রেমের জন্য সব কিছু ছেড়ে দুলীকে নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে। প্রচন্ড আবেগ আপ্লুত হয়ে যৌবনের উত্তাল সাগরে সে ডুব দিয়েছে। দুলীর প্রতি প্রচন্ড প্রেমাকর্ষণে এই পথে পা বাড়িয়েছে। সে এই আকর্ষণ অনুভব করতে পারে। কিন্তু পরিণতির চিন্তা করতে পারেনি। যেমন-

"সাক্ষী থাকিও খোদার আরশ, সাক্ষী থাকিও
নবীর কোরান খানি,
ঘর ছাড়াইয়া, বাড়ি ছাড়াইয়া কে আজ আমারে
কোথা লয়ে যায় টানি!"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৭৭]

তার প্রেমিক সত্তার আরো পরিচয় মেলে গড়াই নদীর তীরে দুলীকে নিয়ে সংসার করার সময়। দুলীকে ভাল রাখার জন্য দুলীর নিষেধ অমান্য করে সে বেপারীর নায়ে বেশী টাকার আশায় কাজ করতে যায়-

"পাটের ব্যাপারে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা, দেখিও তোমার তরে,
জলে-ভাসা-শাড়ী, ময়ূরের পাখা আনিব কদিন পরে।
নাকেতে বুলক, গলায় হাসলী, গোল খাড়ু দুটি পায়
তারি তরে আমি বেপারে চলিনু সুদূর পাটের নায়।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১০৫]

অবশেষে সোজন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে সাত বছর জেল খেটেছে দুলীকে অপহরণের অপরাধে। আবার প্রেয়সী দুলীকে ভুলতে না পেরে সাত বছর পর খালাস পেয়ে সে বেদের নায়ে যোগ দেয় দুলীর সন্ধানের লক্ষ্যে। তার প্রেমের প্রগাঢ়তার কারণেই বহু ঘাটে ঘুরে ফিরে অবশেষে উড়ান খালিতে এসে দুলীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু দুলী কর্তৃক সোজন প্রত্যাখ্যাত হলে তার মনে গভীর বেদনার সৃষ্টি হয়। শুরু হয় সোজন চরিত্রের দ্বন্দ্বময় অবস্থা। সে হিসাব মিলাতে পারে না যে দুলীর জন্য সে ঘর ছেড়েছে, গ্রাম ছেড়েছে। বাপ-মা সব ছেড়ে, সাত বছর জেলের মধ্যে কাটিয়েছে, সেই দুলী যখন তাকে পরপুরুষ বলে অচেনার মত ব্যবহার করে তখন সোজনের হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। কবির ভাষায়-

"দুলী! দুলী! মোরে আরো ব্যথ্যা দাও-
কঠিন আঘাত দাও-দাও-অরো-আরো,
ভেঙ্গে যাক বুক-ভেঙ্গে যাক মন,
আকাশ হইতে বাজেরে আনিয়া ছাড়।
তোমারি লাগিয়া স্বজন ছাড়িয়া
ভাই বান্ধব ছাড়ি মাতা-পিতা মোর,
বনের পশুর সঙ্গে ফিরেছি
লুকায়ে রয়েছি খুঁড়িয়া মড়ার গোর।
তোমারি লাগিয়া দশের সামনে
আপনার ঘাড়ে লয়ে সব অপরাধ,
সাতটি বছর কঠিন জেলের
ঘানি টানিলাম না করিয়া প্রতিবাদ।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ১৪২]

এই মানসিক দ্বন্দ্ব আরো প্রবলরূপ পায় যখন সোজনের আনা শাঁখা, সিঁদুর নিতে দুলী অস্বীকৃতি জানিয়ে তার পূর্বের স্মৃতি বিজড়িত বাঁক-খাড়ু ও নথও ফিরিয়ে দিতে চায়। পূর্ব প্রেমিকার আচরণ তার মধ্যে গভীর বেদনা ও জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে-

এই জীবনেরো আসিবে সেদিন
মাটির ধরায় শেষ নিশ্বাস ছাড়ি,
চিরবন্দী এ খাঁচার পাখিটি
পালাইয়া যাবে শূন্যে মেলিয়া পাড়ি!
সে সময় মোর কি করে কাটিবে,
মনে হবে যবে সারাটি জনম হায়-
কঠিন কঠোর মিথ্যার পাছে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া খোয়ায়েছি আপনায়।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৪৪]

প্রেমিকার প্রত্যাখ্যানে জীবন বিসর্জন দিতে বিষলক্ষের বড়ি খেয়ে সে নদীর ধারে বাঁশিতে করুণ সুর তোলে। তার এই সুরের মূর্চ্ছনায় দুলী ছুটে আসে তার কাছে। তার হৃদয়ে আবৃত প্রকৃত প্রেম প্রকাশ করে দ্বিধাহীন চিত্তে সমস্ত সংশয় দূর করে-

যাইবার কালে এই কথা শুধু বলে যাই তব কাছে,
যে দুলীরে তুমি জানিয়াছ আজ, তাহা ছাড়া আরো আছে,
এক দুলী যার জীবনের প্রতি নিঃশ্বাসটুকু হায়,
চির বিরহিয়া সোজনেরে তার স্মরিতেছে নিরালায়।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৫৮]

দুলীর কথা শোনার পর সোজনের ব্যাকুল আর্তি প্রকাশিত হয় মৃত্যুকে উত্তরণের জন্য-

"কি কথা শুনালে ওহে দুলী তুমি, বল দেখি আরবার,
জীবন যেনরে জুড়াই গেল সাধ হয় বাঁচিবার।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৫৮]

এই কথার মধ্য দিয়ে সোজন চরিত্রের দ্বান্দ্বিকতার অবসান ঘটে। জসীম উদ্‌দীন প্রেমের গভীরতা দিয়ে সোজন চরিত্র অঙ্কন করেছেন। চরিত্র চিত্রণে বাহুল্য কোন উক্তি করেননি। চরিত্রের প্রতিটি গ্রন্থি একের পর এক উন্মোচিত হয়েছে সুশৃঙ্খল বিন্যাসের মাধ্যমে। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে প্রধান চরিত্র সোজন-দুলী যেমনভাবে মূল্যায়িত হয়েছে তার পাশাপাশি সহযোগী চরিত্রগুলিও সমান ভাবে মূল্যায়িত হয়েছে। অপ্রধান চরিত্রের মধ্যে গদাই মোড়ল মুন্সী সাহেব ও রাম নগরের নায়েব উল্লেখযোগ্য। নায়েব চরিত্র এখানে খল বা দুষ্ট চরিত্রের প্রতীক। সে অর্থে ঢাকার নবাব চরিত্র খল যদিও কাব্যে তার প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটেনি। শুধু হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময় তার একটি ভূমিকা ছিল হাজার মুসলমান লাঠিয়াল পাঠানোর ক্ষেত্রে। নমুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গদাই নমুর বিত্তবেসাত ও উদার মানসিকতার পরিচয় ঘটে তার চরিত্রের মধ্য দিয়ে। যেমন-

নমুর মধ্যে নমুর সেরা গদাই মোড়ল নাম,
দেখতে যেমন নামেও তেমন-তেমন তাহার কাম।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৭]

তার নাম ধামেরও গর্ব করার মতো আরো কারণ রয়েছে। তার ঘরে দেবীর মত স্ত্রী, লক্ষ্মী মেয়ে দুলী ও সাতটি পুত্র সন্তান।

গরব তাহার মস্ত বড় আছে ধানের গোলা,
আর আছে তার জোয়ান জোয়ান সাতটি ভাজন পোলা।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৭]

প্রতিবেশী মুসলমানদের সাথে দ্বন্দ্বে তার মত ছিল না। কুচক্রি নায়েবের চাপে পড়ে প্রথম রাজি হলেও শেষ পর্যন্ত তার বিবেকের কাছে নায়েবের চক্রান্ত ধরা পড়ে যায়। মুসলমানদের প্রতি আক্রমণের সব প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেলেও গদাই মোড়ল মন থেকে সায় পায় না তাদের প্রতি আক্রমণের জন্য। তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে-

বহুখণ পরে নিতাই কহিল, "ভাবিয়া এখন হবে না কিছু,
সামনের পানে চলিতেই হবে, পথ যদি নাই হটিতে পিছু।"
গদাই মোড়ল কহিল উঠিয়া, "তোমার কথায় দিলাম সায়,
সামনে যে তবু এগোতে পারিনে, মন যে আমার মানে না হায়!"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৫২]

নমুদেরকে মুসলমানদের প্রতি আক্রমণে বাধা দিয়ে গদাই মোড়ল বলে-

"ফিরিয়া দাঁড়াও" গদাই মোড়ল ঘোষিল উচ্চে সামনে আসি,
"নতুবা আমার বুকের রক্তে মেটাও এ ক্ষুধা সর্বগ্রাসী।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৫৪]

নায়েবের কুচক্রান্ত তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়-

নমুর হইয়া কে দাঁড়াত আগে? রাম নগরের নায়েব বাবু,
কার হুঙ্কারে ছিল এই গাঁয়ে ভিজা বেড়ালের মতন কাবু?

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৫৪]

নায়েবের রক্ষাকালীর আদেশ যে তাদের ঠকানোর জন্য গদাই মোড়ল তা বুঝতে পারে। এখানে গদাই মোড়লের বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন-

রক্ষাকালীর আদেশ পেয়েছি? যার মন্দিরে শিয়াল রয়,
বিড়াল কুকুর যেথা ঘুরে ফিরে, নমু গেলে সেথা ঘটে প্রলয়।
রক্ষাকালীর আদেশ এনেছি, স্বরূপ তাহার বুঝেছি আজ,
যত গরীবের রক্ত চুষিয়া যাহার পূজার হয়েছে সাজ।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ৫৫]

আর সেই সাথে নিজেদের বোকামির জন্য গদাই নিজেকেই ধিক্কার জানিয়েছে বার বার-

ধিক্কার আজি, ধিক্কার মোরে, তাহারি পূজার ফুলের হার,
মাথায় পরিতে ধরণীর তলে লুটায়ে পড়েনি আজি এ ঘাড়।
যার শিরে আজি যত মালা আছে ছিঁড়ে ছিঁড়ে এসো টুকরো করি,
পথের ধূলায় দলিয়া পিষিয়া ও অপমানের পূরণ করি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ৫৫]

নায়েবের চক্রান্ত ধরতে পারলেও প্রথম যে মুসলমানদের আক্রমণ ঠেকানো সম্ভব ছিল তা গদাই মোড়লের পক্ষে দ্বিতীয় বার সম্ভব হয় না। কারণ তার কুলসম্ভ্রমের উপর কালিমা এঁকে দিয়ে তার মেয়ে বিয়ের আসর থেকে সোজনের হাত ধরে পালিয়েছে। এই বিষয় পরে বিরাট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় পরিণত হয়।

এই সাম্প্রদায়িক কলহের পেছনে যে নায়েবের হাত আছে তা সে পূর্বে বুঝতে না পারলেও পরে বুঝতে পারে যখন সে সাত-সাতটি ছেলে হারিয়ে সর্বস্বান্ত। আশি বছরের বৃদ্ধ গদাই মোড়লের সঙ্গে যখন তারই বয়সী আর এক বৃদ্ধের বহুদিন পর দেখা হয় গদাই মোড়ল নিজের আবেগকে ধরে রাখতে পারে না। তার সুখ-দুখের

সাথী ছমির লেঠেলকে জানায় তাদের এই করুণ পরিণতির জন্য যে দায়ী তার বিরুদ্ধে সে নেবে আজ চরম প্রতিশোধ-

"না ভাই আমি শোধ লইব–শোধ লইব আজ,
যে পরাল আজ আমাদের এমন কাঙাল সাজ।
শিমুলতলীর গদাই মোড়ল, ডাক শুনিয়া যার,
সাতশ নমু যখন তখন মিলত এসে সার।
আজ কোথা যে সাতশ নমু? সোনার শিমুলতলী,
জমিদারের বাজার যেথা বসছে গলি গলি।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১১৭]

তার আত্মোপলব্ধি থেকে বের হয়ে আসে–

কাইজা করে কি ফল পেলাম? নমু মুসলমান,
কেউ ঘুমাল গোরে, কেহ চিতায় দিল প্রাণ!

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১১৯]

চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য সে ছমির লেঠেলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তারই আয়োজন করে। গদাই মোড়ল যেন অত্যাচারী নায়েব বা জমিদারদের দ্বারা অত্যাচারিত আত্মা যে হাজার দুঃখ কষ্টে বেঁচে আছে শিমুলতলীর অতৃপ্ত আত্মার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য, যায় ফলে–

পরের দিনে সকাল বেলা দেখল পথিক জন,
এপার বিলের কবর বাঁধা ওপার চিতা কোন!

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১২০]

অত্যাচারী নায়েবের শেষ পরিণতি ভয়ানক-

খবর–খবর–কিসের খবর–গুজব শুনি গাঁয়,

রামনগরের নায়েব মশার খোঁজ না পাওয়া যায়।

কদিন পরে দেখল সবে বিলের ধারে খুঁড়ে,

নায়েব মশার আধেক দেহ ঘুমিয়ে কবর জুড়ে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ১২০]

এভাবেই প্রতিশোধের মধ্যদিয়ে অন্তরের জ্বালা মেটায় গদাই মোড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে নতুন করে গড়ে ওঠে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বন্ধন।

অত্যন্ত সাবলীল ও মানবিক বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন গদাই মোড়ল চরিত্র অঙ্কন করেছেন জসীম উদ্‌দীন। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে আর এক উজ্জ্বল চরিত্র মুন্সী সাহেব। তাঁর বিচক্ষণতা মুগ্ধ হওয়ার মত। নমুদের শিমুলতলী আক্রমণের কথা জেনে তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে গ্রামের সকলকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন নমুদের গাঁ-এ মুসলমানরা সংখ্যালঘু। নমুরা অতর্কিত আক্রমণ চালালে তাদের বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না, তাই তিনি দূরে কাজির গ্রামে স্বজাতিদের কাছে আশ্রয় নেওয়ার প্রস্তাব করেন। গ্রামের সকলে বিনা প্রতিরোধে গ্রাম ত্যাগ করতে না চাইলে তিনি বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সকলকে বোঝাতে সক্ষম হন-

"মুসলমানের যেথায় বসতি সেথা মসজিদ আপনি হবে,

মানুষ মরিলে মস্‌জিদে বসে আল্লাহর নাম কাহারা লবে?

বল বল ভাই, কখনো ইটের স্তম্ভের আজ রাখিতে নাম,

কেন এ মৃত্যু-কবলে ঝাঁপিয়ে পড়িবে তোমরা মুসলমান?

কথা শুন ভাই, কাজির গাঁয়েতে আমরা সকলে পালায়ে যাই,

সেথায় মোদের আশ্রয় দিবে মুসলমানেরা জাতের ভাই।
সেখানে আমরা দলে বেশী হব, দরকার হলে সুযোগ বুঝে,
আজের দিনের যত প্রতিশোধ লইব নমুদের সমানে যুঝে।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৪৯]

সোজন-দুলীর পালিয়ে যাওয়া নিয়ে নমুরা কাজির চর আক্রমণ করতে আসার সময় এই আশি বছরের বৃদ্ধ মুন্সী সাহেবও মুসলমান লেঠেলদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন-

"আজ সে বুকের হাড় কখানো, নাড়া দিলেই পড়বে খসে,
তবু এখন ঘরের কোণে থাকতে নাহি পারব বসে।
তোমরা যদি সবাই যাবে সঙ্গে লহ আমায় তবে,
মরণ যদি হয়ই এমন, সেই মরণের গরব রবে।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৯০]

আর কাজির চরের সমস্ত মুসলমানদের প্রতি তাঁর নির্দেশ-

"কথার এখন নাই অবসর, হাতে লহ হাতের লাঠি,
হু-হুঙ্কারে লাফিয়ে উঠে কাঁপাও আকাশ, কাঁপাও মাটি।
মাঠ ভরে আজ গর্জে নমু, ওই তাহারা পড়ল এসে,
শিমুলতলীর গাঁয়ের ছেলে, এবার সাজ বীরের বেশে।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৯০]

মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী এই মুন্সী সাহেবও স্বমহিমায় উজ্জ্বল। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে একটি মাত্র খল চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় আর সে হল রাম

নগরের নায়েব। জসীম উদ্‌দীন এই অত্যাচারী নায়েবের স্বরূপ স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন-

রামনগরের নায়েব মশায়, যম যেন স্বয়ং বসে,
ভিটে নিলেম, ডিগ্রীজারী করেন বাকী খাজনা কসে।
সেলামী, আর নজরা-আনা কিস্তি খেলাফ সুদের বোঝায়,
ভুঁড়ির উপর বাড়ছে ভুঁড়ি, দিনে যতই দিন চলে যায়।
ইহার পর 'মাথট' আছে 'বাড়তি' আছে 'কমতি' আছে,
যে দিকে চাও হাত বাড়ালে হাত যে ঠেকে টাকার গাছে।
ঘড়ি ঘড়ি বাজছে টাকা, সামনে দিয়ে পিছন দিয়ে,
কানে কানে কান কথাতে চোখ-টেপাতে ঝনঝনিয়ে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ৩৫]

রামনগরের নায়েবের একটি কলমের খোঁচায় মানুষ হয়ে যেতে পারে সর্বস্বান্ত।

রাম নগরের নায়েব মশায়, কানে তাঁহার কলম গোঁজা,
ছোট হলেও সেই কলমের ইতিহাসটা নয়কো সোজা।
তারি একটা আঁচড় লেগে গেছে কত চালের ছানি,
কত ভিটায় চরছে ঘুঘু, ইহার হদিস্ আমরা জানি।
সেই কলমের খোঁচায় খোঁচায় খুড়েছে সে অনেক কবর
তাহার তলে ঘুমায় যারা, কেবা রাখে তাদের খবর?

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ৩৫]

শিমুলতলী গ্রামে জমিদারের হাট বসানোর পাঁয়তারা তার অনেক দিনের ইচ্ছে। হিন্দু-মুসলমানদের ঘনিষ্টতার কারণে সে সুযোগ করে উঠতে পারেনি। তবে তাকে

বেশি দিন সুযোগের অপেক্ষা করতে হয়নি। মহররমের লাঠি খেলাকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের ফাটল ধরে আর সেটিকে কাজে লাগায় এই নায়েব। সে জানে যতদিন হিন্দু-মুসলমান একত্র থাকবে তার পক্ষে কখনোই নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করা সম্ভব হবে না। গদাই মোড়ল নায়েবের সামনে নালিশ নিয়ে যাওয়ার পর সে স্বর্গ হাতে পায়। তার সেই উৎফুল্ল চিত্তের প্রকাশ-

গুড়গুড়িতে টান্ মারিয়া খানেক কেশে খানিক হেসে,
বল্লে, "কিহে, গদাই মোড়ল, খবর বল সাম্নে এসে।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ৩৯]

গদাই মোড়ল মহররমের ঘটনা বর্ণনার পর সে ভাল মানুষের মুখোশ পরে নমুর সুহৃদ হয়ে যায় আর ভেতরে ভেতরে তার আনন্দ প্রকাশিত হয়।

"কি বলিলি গদাই মোড়ল"- গর্জি উঠেন নায়েব মশায়;
ঝড়ের রাতে বিজলী যেমন, চোখ দুটিতে আগ উগরায়।
"নমুন মাথায় লাগায় বাড়ি, এতই সাহস নেড়ের বুকে,
গোখরো সাপের লেঙুর ছিড়ে আজো তারা ঘুমায় সুখে?"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ৩৯]

এই বিষয়কে কেন্দ্র করে সে হিন্দু-মুসলমান এর ভেতর সাম্প্রদায়িক বীজ বপন করে। তার এই সাম্প্রদায়িক বীজই পরবর্তী সময়ে সোজন দুলীর পালানোকে কেন্দ্র করে ডাল-পালা বিস্তার করে শক্ত শেকড় গড়ে তোলে। শিমুলতলীর অসহায় সহজ-সরল নমুদেরকে মুসলমানদের প্রতি ক্ষেপিয়ে সে তার স্বার্থ পূরণ করে। কাজির চরে নমু মুসলমান দাঙ্গায় দুই পক্ষেরই বহু ক্ষয়-ক্ষতি হয়। আর ফায়দা লোটে নায়েব। শিমুলতলী গাঁ এ শ্মশান এর উপর জমিদারের হাট যেন হিন্দু-মুসলমানের মূঢ়তাকে

পরিহাস করে দাঁড়িয়ে থাকে। মহরমের লাঠি খেলাকে কেন্দ্র করে নায়েব নমুদের মুসলমানদের প্রতি ক্ষেপিয়ে তুললেও গদাই নমু তার এই চালাকি ধরে ফেলে কিন্তু হিন্দু ঘরের মান সম্মান সোজন ধূলায় ফেলে দিয়েছে এই কথা মনে পড়ার পর গদাই নমু মাথা ঠিক রাখতে পারে না এবং ধরা পড়ে যায় কুচক্রি নায়েবের ইন্দ্রজালে। কবি দুঃখ ভারাক্রান্ত চিত্তে বলেছেন-

নমু-মুসলমানের পাড়া শিমুলতলী গেরাম ভরি,
জমিদারের হাট বসেছে নায়েব মশার সুনাম ধরি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১১৫]

যুগে যুগে এই সব অত্যাচারী, কুচক্রি, দুষ্ট লোকের জন্য সংঘটিত হয় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কলহ, বিবাদ, ধ্বংস হয় বাড়িঘর, সংখ্যা বাড়ে কবর ও চিতার। এই দুষ্ট নায়েবের চক্রান্তেই নারী হরণের মামলায় সোজনের সাত বছর জেল হয়। দুলীকে জোর করে অন্যত্র বিয়ে দেওয়া হয়। তবে অত্যাচারী এই মানুষটিও প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে। তার উপর চরম প্রতিশোধ নিয়ে গেছে শিমুলতলী ও কাজি চকের নির্দোষ মানুষগুলোর অকালে ঝরে যাওয়া আত্মা। গদাই মোড়ল ও ছমির শেখ একত্রিত হয়ে তাদের গ্রামের পক্ষ থেকে প্রতিশোধের পথে অগ্রসর হয়-

মাল-কোছাতে কাপড় পড়ে ছমির লেঠেল কয়,
"নমু-মুসলমানের আজি নূতন পরিচয়।
দেশ জুড়িয়া কবর খুঁড়ি শুইয়েছি সব ভাই,
শ্মশান ঘাটায় নিবেছে চিতা বক্ষে নেবে নাই।
তীব্র তাহার অনল জ্বালা অঙ্গে মেখে তবে।
দুভাই এস লাফিয়ে পড়ি যা হবার তা হবে।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১২০]

নায়েব মশাই সোজন-দুলীর পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নমুদেরকে নির্দেশ দেয়-

গ্রাম জ্বালাইবি-বন পোড়াইবি মুন্ডু কাটিবি-
যারে যেথা পাবি খুঁজে,
তারপর আছে সদর কাছারী, থানার দারোগা,
আমি নিব সব বুঝে!
ডিগ্রী করিয়া ডিগ্রী জারীতে ভিটামাটি ঘর
লইব নিলাম করি,
হাহাকার করে কাঁদিয়া ফিরিবে পথে পথে তারা,
বলিনু শপথ করি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৮৩]

এই নায়েব খারাপ কাজে ধ্বংসের পথ সহজ-সরল মানুষদের টেনে-হিঁচড়ে ফিরেছে, একটি বারের জন্যও চিন্তা করেনি যে সদর কাছারীর চাইতেও বড় সদর কাছারী আছে আর সে তার মধ্যে ধরা পড়বে। শিমুলতলীর গ্রামের অভিশাপে জর্জরিত নায়েবের শেষ পরিণতি মর্মান্তিক। তার অর্ধেক দেহ চিতায় ভস্মিভূত আর অর্ধেক কবরে।

'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের প্রতিটি চরিত্র জসীম উদ্‌দীন এমনভাবে জীবন্ত করে সৃষ্টি করেছেন যা থেকে মনে হয় এই মানুষগুলি বাঙলার পরিচিত পরিবেশে লালিত বর্ধিত। কুচক্রি নায়েব চরিত্র প্রতিনিয়তই প্রতিটি সমাজে বিচরণ করে।

'সকিনা'

কবি জসীম উদ্‌দীন 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' (১৯২৯) কাব্য রচনার প্রায় কাছাকাছি সময়ে আরো একটি কাহিনী কাব্য সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৩) রচনা করেন। এই দুটি কাব্য রচনার পর তিনি দীর্ঘদিন আর কোন কাহিনী কাব্য রচনা করেননি। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের প্রায় পঁচিশ বছর পর তৃতীয় কাহিনী কাব্য 'সকিনা' রচনা করেন। দীর্ঘদিন পর 'সকিনা' রচনা করেলেও তার মধ্যে পূর্ববর্তী কাব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাননি। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' এ কবি ভিন্ন গ্রামের তরুণ-তরুণীর অনুরাগ এর সঙ্গে পল্লীর প্রতিদিনকার ঘর কন্নার চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন এবং সেই সাথে দুই তরুণ-তরুণীর জীবনের ট্রাজেডি দেখিয়েছেন। আবার 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে ভিন্ন ধর্মের নর-নারীর প্রেম ও এর ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তার ফলে সোজন-দুলীর জীবনে ট্রাজেডি দেখিয়েছেন। পূর্ববর্তী দুটি কাব্যের মধ্যে ট্রাজেডি দেখালেও তাদের কাহিনী ছিল ভিন্ন। তাই 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যে যত সরল গতিতে ঘটনা ধাবিত হয়, 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে তা জটিল রূপ ধারণ করে কাহিনী মোড় নেয় ভিন্ন ধারায়। 'নক্সী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এর চাইতে 'সকিনা' সম্পূর্ণই ভিন্নধর্মী বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত। আগের দুটি কাব্যের সঙ্গে এই কাব্যের তেমন কোন মিল নেই। তবে এই কাব্যেও তিনি পল্লীর উপাদান ও পল্লীর নর-নারীকে প্রাধান্য দিয়েছেন। অর্থাৎ এই কাহিনী কাব্যের মধ্যে কবি যে প্রেম দেখিয়েছেন তা পল্লী কেন্দ্রিক, তবে 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের মতো প্রেমের স্বপ্নীল জগৎ এখানে নাই। সকিনাতে প্রেম এসেছে জটিল রূপ ধারণ করে। আগের কাব্যে প্রেম যেমন তরুণ-তরুণীর জীবনে নানা আবেগঘন মুহূর্ত মোহনীয় হয়ে ধরা দেয় তাদের হৃদয় প্রেমের জন্য ক্ষত-বিক্ষত হয় তারা গুমরে কাঁদে একান্তে। তারা দুজন দুজনের প্রতি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকে। তারা পল্লীর মাঠ, ঘাট, পুকুর একান্ত প্রকৃতির সবুজ পরিমন্ডলে উপস্থাপিত। এখানে

প্রেমের পথে কন্টক থাকলেও তা বাইরের পারিপার্শ্বিকতার জন্য। নিজেদের ভেতরে প্রেম নিয়ে তাদের মধ্যে কোন সংশয় দেখা দেয়নি। যদিও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে দুলীর অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেলে সাত বছর পর দুলীর সাথে দেখা হলে দুলীর কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সোজন অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগেছে তবে তা ছিল সাময়িক। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যে প্রায় অনুপস্থিত আর এখানেই 'সকিনা' ভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমুজ্জ্বল। প্রেমের ভেতর যেমন জটিলতা কবি দেখিয়েছেন তেমনি 'সকিনা' কাব্যে নর-নারীর অর্ন্তদ্বন্দ্ব বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই অর্ন্তদ্বন্দ্ব আদিল চরিত্রের মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট'-এ পল্লীর নর-নারীর যে প্রেম চিত্রিত তা প্রকৃতির মত স্নিগ্ধ। তাদের প্রেমে প্রবেশ করতে পারেনি কোন পঙ্কিলতা তাই এই কাব্য দুটি যেন সরল রৈখিক গতিতে ধাবমান। 'সকিনা' কাব্যে প্রেমের জটিলতা পঙ্কিলতার সাথে সমাজে লম্পট ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ আগের দুটি কাব্যের মতো এখানে শুধু প্রেমের জন্য জীবন নিঃশেষ হওয়া নয় এখানে রয়েছে বেঁচে থাকার নিষ্ঠুর বাস্তবতা। একজন নারী সমাজে পদে পদে অপদস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তার আত্মমর্যাদা নিয়ে উজ্জ্বলভাবে বেঁচে থাকে। তার আলোকচ্ছটা যেন প্রতিটি ভাগ্য-বিড়ম্বিতা নারীর হৃদয়। 'সকিনা' কাব্যের ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে জানা যায় অভাবের তাড়নায় গরীব বাবা রূপবতী সকিনাকে এক দাগী চোরের সাথে টাকার বিনিময়ে বিয়ে দেয়। কিন্তু তার এ বিয়ে টেকেনি। এই দাগী চোর 'সকিনা'-কে নানা কল্পিত অপরাধে অত্যাচার করত। স্বামীর কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে সে সমাজে বিভিন্ন মুখোশধারী লম্পটদের ভোগের সামগ্রী হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মৌলভী সাহেব, ঠিকাদার এবং আরো অনেকে। তার এই অভিশপ্ত জীবনে এক চিলতে আলোক রশ্মি নিয়ে তার প্রেমে ধরা দেয় জমিদার আদিল। সকিনাকে সমস্ত আবর্জনা থেকে মুক্ত করে সে তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। সকিনা জানে তার পাপপূর্ণ জীবনে একজন

অপাপবিদ্ধ মানুষের জীবন একত্রিত হওয়া ঠিক নয়। তাই প্রথমে এ সম্পর্কে রাজি না হলেও পরবর্তী সময়ে আদিলের প্রেমের প্রবল টানে সকিনা রাজি হয়। সকিনার প্রতি আদিলের রূপজমোহ কাটার পর সে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে। সকিনাকে সে ঘর থেকে বিতাড়িত করে। সকিনা এক দিন দুঃখী তিনু ফকিরের কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় পায়। তিনু ফকির সারিন্দার সুরে সকিনার কাহিনী আপামর জনসাধারণকে শোনায়। এদিকে আদিলের হৃদয় সকিনাবিহীন শূন্য মনে হয়, সে সকিনার প্রেমে ও তার ঔরসজাত সন্তানের টানে সংসার ছেড়ে বিবাগী হয়। সকিনা সন্তানের মাতা হলে তিনু ফকির সকিনার সন্তানের পিতা আদিলের সন্ধানে যায়। নানা ঘটনার আবর্তে অবশেষে আদিলের সঙ্গে সকিনার সাক্ষাৎ হয়। আদিল তার ভুল স্বীকার করে সকিনাকে পুনরায় ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সকিনা তার সন্তানকে পিতার হাতে সমর্পণ করে নিজে চলে যায় অন্যত্র। 'সকিনা' চরিত্রের এই যে ত্যাগ তা তার ব্যক্তিত্বকে মহিমান্বিত করেছে। একজন পল্লী নারীর পক্ষে নিজ স্বামীকে ফিরিয়ে দেয়া ও সন্তানকে স্বামীর কাছে দিয়ে নিজে না যাওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজ। যার জন্য প্রয়োজন প্রচণ্ড মনোবল ও আত্মবিশ্বাস যা কবি সুন্দরভাবে সকিনা চরিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

জসীম উদ্‌দীনের 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যদ্বয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। সে দিক থেকে সকিনা ততটা আলোচিত না হলেও এই কাব্যের নারী চরিত্র সকিনা রচনায় কবি যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। এই কারণে তাঁর অন্য দুটি কাব্যের নারী চরিত্রের চাইতে সকিনার ব্যক্তিত্ব আলাদা। তার একটা নিজস্বতা রয়েছে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে সে বাস্তব বুঝতে পেরেছে। কিন্তু নক্সী কাঁথাতে কিংবা সোজন বাদিয়ায় নারীরা তাদের এই দিকটি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না। 'সকিনা' কাব্যে কবি প্রেমের জটিলতা, ঘটনার বিভিন্নতা, চারিত্রিক দ্বান্দ্বিকতা

ইত্যাদির সঙ্গে গ্রামীণ পথ, ঘাট, নদী, বন, কুটির প্রভৃতিও সুচারুরূপে অঙ্কন করেছেন। অর্থাৎ এখানেও দেখা যায় তিনি পল্লীর আবেশ ধরে রাখতে চেয়েছেন। তবে এই পল্লীর মানুষদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রবণতাকে বেশি করে দেখাতে চেয়েছেন। গ্রামের গরীব ঘরের রূপসী মেয়ে সকিনা, তার হৃদয়ের ক্রন্দনের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় বাস্তবতা কত নির্মম, অস্তিত্ব রক্ষা কত কষ্টকর তবু সে টিকে থাকতে পেরেছে-

একটি বিপদ হতে উদ্ধার পাইবার লাগি তার,
আরটি বিপদে পড়িতে হয়েছে বদলে এ দেহটার।
পণ্যের মত দেহটারে সে যে বিলায়েছে জনে জনে,
কোন লালসার লাগি নহে শুধু বাঁচিবার প্রয়োজনে।

[সকিনা-পৃঃ ৬]

বাস্তবতার কঠোর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত সকিনার অর্ন্তজ্বালা-
সে শুধু ক্ষুধার আহারের লাগি কে তাহা বুঝিতে পাবে?
সবাই তাহারে চিন্তা করিবে নানা কুৎসিতভাবে!

[সকিনা-পৃঃ ৬]

অর্থাৎ জসীম উদ্‌দীন নানা অভিজ্ঞতার আলোকে বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষের জীবনে শুধু একটানা নির্ভেজাল প্রেমই থাকে না সেখানে থাকে নানা পঙ্কিলতা, সামাজিক নানা দ্বন্দ্ব। আর তার 'সকিনা' কাব্যের প্রেমের জটিলতার সঙ্গে তিনি ব্যক্তি হৃদয়ের নানা দ্বান্দ্বিকতার প্রতিচ্ছবি দেখিয়েছেন। মূলত ব্যক্তি হৃদয় একবার সমস্ত আবর্জনাকে দূরে ঠেলে হৃদয়ের ভালবাসাকে জয়ী করতে চায় কিন্তু অপর দিকে থাকে নানা সংশয় ও কষ্টের জ্বালা।

'সকিনা' কাব্যের এই দিকটার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে গ্রীক দেবতা জেনাসের সঙ্গে। তার এক হাত অতীতের দিকে প্রসারিত এবং অপর হাত ভবিষ্যতের দিকো মানসিক দ্বন্দ্ব, সংশয়, পশ্চাৎমুখিতা এই বিষয়গুলি কবি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। 'সকিনা' কাব্যের নর-নারীদের সমাজের নানা কুসংস্কার আষ্টে পিষ্টে বেঁধে রেখেছে। তারা প্রাণ দিয়ে একে অপরকে ভালবাসতে চেয়েছে কিন্তু যখনই প্রেমের মহিমায় নিজেদের বিলীন করে দিতে চায়, তখনই তাদের ঘিরে রেখেছে নানা সংস্কার সংকট, সংশয়। তাদের হৃদয় ভেঙে চৌচির কিন্তু তারা এর থেকে বের হয়ে আসতে পারে না। তাদের একদিকে ভালবাসা পরক্ষণেই ঘৃণার সৃষ্টি।

জসীম উদ্‌দীন দুটি কাহিনী কাব্যের মতো এটিতেও গ্রাম্য গানের উদ্ধৃতি প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে ব্যবহার করেছেন। যা প্রতিটি অধ্যায়ের সারাংশ বহন করে, অর্থাৎ উদ্ধৃতি থেকেই ঘটনার প্রবহমানতা উপলব্ধি করা যায়। 'সকিনা' কাব্যের শুরুতেই নিম্নোক্ত গ্রাম্য গীতির উদ্ধৃতি রয়েছে-

কান্দিয়া আকুল হইলাম বইসা নদীর কূলে,
আমায় কেবা পার করে।
ছায়া নিবার গেলাম আমি বট বিরিক্ষির তলে,
সেওনা বৃক্ষ দেয় না ছায়া আমার কর্ম ফলে।
খেয়া ঘাটের পার গেলাম পার হইবার আশে,
আমারে দেখিয়া নাও দূরে দূরে ভাসে।
কালো জলের কালো কুম্ভির উঠলো বালুর চরে,
কখন যেন ধইরা খায় প্রাণ কাঁপে মোর ভরেরে।

[মুর্শীদা গান, সকিনা-পৃ: ১]

প্রথম অধ্যায় পাঠের পর বোঝা যায় উদ্ধৃতির সঙ্গে অধ্যায়ের সম্পর্ক। সকিনা যেখানেই যায় না কেন দুঃখ তার পেছন ছাড়ে না। আবার অধ্যায়ের শেষে আদিল যখন 'সকিনা'র উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে পথে পথে ঘুরে অবশেষে সাক্ষাৎ পেলেও তাদের মধ্যে বেজে ছিল বিচ্ছেদের ঘন্টা। কবি এখানেও গ্রাম্য গীতি ব্যবহার করেছেন কাহিনীর এই বৈশিষ্ট্য নির্দেশে-

কুল ছাড়লাম মান ছাড়লাম হৈলাম সর্ব্বত্যাগী,
সুখের ঘরে দিয়ে অনল হৈলাম দুঃখের ভাগী।

[বিচ্ছেদ গান, সকিনা, পৃ: ৬৫]

'সকিনা' কাব্যের সকিনা 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যের নায়িকা সাজু ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের নায়িকা দুলীর মতো নয়। সাজু ও দুলী যেমন সরল ছিল 'সকিনা' তার বিপরীত। তার জীবনে প্রেমের সূর্য উদয় হওয়ার আগেই অস্তের লাল আভায় তা নিমজ্জিত। নারী জীবনের চরম সার্থকতা ভালবেসে দেহমন একজনকেই বিলিয়ে দেবে, তা তার ভাগ্যে হয়ে উঠেনি। তার জীবনের চরম পরিণতি ঘটে দাগী চোর স্বামীর কাছ হতে নিস্তার পাবার আশায় হাতে পড়ে সমাজের লম্পটদের। এ যেন নিভন্ত চুল্লী থেকে জ্বলন্ত অগ্নি কুন্ডলীতে নিক্ষেপ। তাই সাজু ও দুলীর মত সে নয়। তাই রূপাই ও সোজনের মতো কাউকে সে পায়নি। নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সকিনা বাস্তবতার সাথে সাথে জীবনের জটিল অর্থ খুঁজে পায়। 'সকিনা' কাব্যে নর-নারীর জটিল প্রেম, অন্তর্দ্বন্দ্বের সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের যে বর্ণনা কবি দিয়েছেন তা বাস্তবধর্মী। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যার পর ভুক্তভোগী নিরূপায় মানুষের ঘর-বাড়ী, গবাদী পশু সব পানিতে ভেসে যায় এবং এর সঙ্গে সকিনার দুরবস্থার কথাও জানা যায়। সবার মতো সকিনাও বন্যা কবলিতদের দলে ভেড়ে, তারও ছোট কুটীরে থাকার স্থান ডুবে যায় পানিতে। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে নিজ সন্তানকে নিয়ে

কলার ভেলায় ভেসে উপস্থিত হয় রেল সড়কে। সেখানে তিনু ফকিরের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সকল বন্যাকবলিত লোক নিয়ে তিনু ফকির সাহায্যের জন্য শহরে যায়। তিনু ফকির চরিত্রে কবি মানব-দরদী একটি রূপ তুলে ধরেছেন। জসীম উদ্‌দীন তাঁর প্রতিটি কাহিনী কাব্যে নর-নারীর জটিল প্রেমের সাথে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও চরিত্র বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। প্রথমেই আদিল চরিত্রের যে মানসিক দ্বন্দ্ব তা শুরু হয় সকিনাকে পাওয়ার পর। আদিল সকিনার প্রেম প্রত্যাশী। সে জানে অভাবের তাড়নায় সকিনা নানা হাত বদল হয়েছে। তাই সে চেয়েছে তার ভালবাসা, উদারতা দিয়ে সব কালিমা থেকে সকিনাকে আগলে রাখতে–

"এই বুক মোর এত প্রসারিত, তাহার আড়াল দিয়া,
দুনিয়া ছড়ান তব কলঙ্ক রাখিব আবরিয়া।
এ বাহুতে আছে এত বিক্রম, তার মহা-মহিমায়,
এতটুকু গ্লানি আনিতে পাবে না কেউ ও জীবনটায়।"

[সকিনা, পৃঃ ৬]

শুধু তাই নয়, আদিলের ভালবাসা সকিনার জীবনে চাঁদের জোছনা ঝলকের মত ছড়িয়ে পড়বে-

আদিল কহিল, "সুন্দর মেয়ে! থাক চাঁদ মেঘে ঢাকা,
তুমি যে উদয় হও মোর মনে জোছনা ঝলক এঁকে।
মোর ভালবাসা চান্দের সম, তব কলঙ্ক তার
শোভা হয়ে শুধু ছড়ায়ে পড়িবে নানা কাহিনীতে আর।"

[সকিনা, পৃঃ ৫]

আদিল সকিনাকে নিয়ে সংসার পাতে। তার মনের ভেতর ভালবাসার সাত রং যেন লুকোচুরি খেলা করে। সে সকিনার দেহের আরশীতে বেহেস্ত দেখবে, দেহের মোমবাতির শিখায় আগুনের ধোঁয়া হবে, সকিনার অধরে বাঁশীর সুরে সুর সৃষ্টি করবে ইত্যাদি নানা কল্পনায় আচ্ছন্ন আদিলের মন-প্রাণ দেহ। কিন্তু তার সবকিছু ধুলিস্যাৎ হয়ে যায় সকিনার অতীত জীবনের বিষময় স্মৃতি মনে পড়ায়। শুরু হয় তার মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্ব। যেমন–

সকিনার সেই ফুল দেহখানি সোহাগে বুকেতে টানে,
কোন্ সে গোখুরা সাপ যে শোষায় আদিলের কানে কানে।
ও রাঙা দেহের মুকুরে সে দেখে কি যেন ভীষণ ছবি,
তাহার মায়ায় জ্বলে পুড়ে যায় যাহা কিছু তার সবি।

[সকিনা, পৃঃ ১০]

আদিল কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারে না। সে হৃদয়ের গভীর থেকে ভালবাসতে চায় কিন্তু পারে না। শুধু মনে পড়ে যায় সকিনার অতীত জীবনের কথা-

এই দেহ লয়ে লালসার খেলা খেলিয়াছে জনে জানে,
তারা যেন আজ ভিড় করে এসে উপহাসে তার মনে।

[সকিনা, পৃঃ ১০]

আদিলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সকিনার নানা হাত বদলের ছবি-

ছবির উপরে ছবি ভেসে আসে, লম্পট ঠিকাদার,
বহুদিন তার ঘরেতে থাকিতে হয়েছিল সকিনার।
সেই দুরাচার তাহার ঠোঁটেতে দিয়েছিল কামড়িয়ে,
সেই দাগ আজও লাগিয়া রয়েছে ঠোঁটে তার আটকিয়ে।

[সকিনা, পৃ: ১১]

কুলটা রমণী তার স্ত্রী, ভবিষ্যতে তার সন্তানের মা হবে এই বাস্তবতা আদিল মেনে নিতে পারে না -

সেই সে কুলটা রমণী আজিকে অর্দ্ধাঙ্গিনী তার,
এই কথা যেন প্রতি রোমে রোমে হানে তারে ধিক্কার।

[সকিনা, পৃ: ১১]

আদিল তার মনের কাছে অসহায় হয়ে পড়ে। অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত আদিল অবশেষে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, সে সকিনাকে বেঁচে থাকতে দেবে না। তাই গভীর রাতে সে সকিনাকে পদ্মার পারে নিয়ে যায়। সকিনার ঘুম ভেঙে গেলে আদিলের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চায়। নিজের জন্য নয়, তার গর্ভে আদিলের সন্তানের জন্য। আদিল সকিনাকে বলে-

"নল খাগড়ার এই পথ দিয়ে খানিক এগিয়ে গেলে,
ঘন পাট ক্ষেত, ওই ধারে গেলে চরের গেরাম মেলে!
সেই পথ দিয়ে যত দূর খুশী হাটিয়া যাইবি পায়,
মোর পরিচিত কেউ যেন কভু তোরে না খুঁজিয়া পায়।"

[সকিনা, পৃ: ২১]

সকিনার প্রতি রূপজ মোহ কেটে গেলে এভাবেই অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগে শেষে সকিনাকে সে বিতাড়িত করে তার জীবন থেকে। এত কিছুর পরও সে তার জ্বালা নিভাতে পারেনি। কারণ প্রেমের জ্বালা ছিল আদিলের কাছে প্রকট। সে সকিনাকে প্রকৃত ভালবেসেছিল বলে সকিনাশূন্য বাড়ী তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে-

এখানে সকিনা বাটনা বাটিত, আধেক হলুদ বাটা,
বিগত দিনের অনুরাগ যেন লিখিয়া রেখেছে পাটা।

[সকিনা, পৃ: ৩৬]

আদিল অনুশোচনায় দগ্ধ হয়। অসহায় এক নারী নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে লম্পট ঠিকাদার, মৌলভী ও গুন্ডার খপ্পরে পড়েছিল। আদিল তাদের কাছ থেকে উদ্ধার করে তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেও সেও মানসিক সংঘাতে জর্জরিত হয়ে তাকে পুনরায় গৃহহীন করে। এই অনুশোচনায় জর্জরিত আদিল বাড়ি ঘর ছেড়ে বিবাগী হয়ে যায়। তা মনে পড়ে সকিনার কথা, সন্তানের কথা, খুঁজতে বের হয় তাদের। জসীম উদ্‌দীন এখানে আদিল চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের সাথে তার যে অনুশোচনা এবং নিজ কর্মের ফলে তার এই অবস্থা তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। মিথ্যা সমাজ ভীতির জন্য সে আজ তার প্রেমাস্পদ সকিনা, বুকের মানিক সন্তান ছাড়া। তাই সে ঠিক করে তার এই অভিশপ্ত জীবনের পাপ সে মোচন করবে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে। সে পথে পথে ঘুরে তার স্ত্রী সন্তানকে খোঁজ করে। নানা প্রতিকূলতা ও দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর দুজনের আবার সাক্ষাৎ হয়। আদিল পুনরায় সকিনাকে আহ্বান করে ঘরে ফেরার। কিন্তু সকিনা আদিলের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। আদিলের প্রতি সকিনার উক্তি-

"মিথ্যা লইয়া কতকাল পতি প্রবোধিব আপনায়?"
ম্লান হাসি হেসে শুধায় সকিনা, "দুঃখের দাহনায়
অনেক সহিয়া শিখেছি বন্ধু, মিছার বেসাতি করি
ভবের নদীতে ফিরিছে কতই ভাগ্যবানের তরী।
সেথায় আমার হলনাক ঠাঁই, দুঃখের নাহি যে তায়,
সান্ত্বনা রবে, অসত্য লয়ে ঠকাইনি আপনায়।"

[সকিনা, পৃ: ৬৬]

কিন্তু আদিল সকিনাবিহীন জীবনের যে যন্ত্রণা তা তিলে তিলে বুঝতে পেরেছে তাই সে মিথ্যা সমাজনীতিকে আর তোয়াক্কা না করে ভালবাসার নতুন পৃথিবী রচনা করার প্রত্যাশায় খুলে দিতে চায় নতুন দ্বার-

আদিল কহিল, "আমিও জীবনে অনেক দুঃখ সয়ে,
নতুন অর্থ খুঁজিয়া পেয়েছি তোমার কাহিনী লয়ে।
আর কোন খ্যাতি, কোন গৌরব, কোন যশ কুলমান,
আমাদের মাঝে আনিতে নারিবে এতটুকু ব্যবধান।
বিরহ দাহনে যশ কুলমান পোড়ায়ে করেছি ছাই,
তোমার জীবন স্বর্ণ হইয়া উজলিছে সেথা তাই।
চল ঘরে যাই নতুন করিয়া গড়িব সমাজ নীতি।
আমাদের ভালবাসা দিয়ে সেথা রচিব নতুন প্রীতি।"

[সকিনা, পৃঃ ৬৭-৬৮]

আদিলের অনুরোধ প্রত্যাখান করে সকিনা প্রমাণ করে দেয় নারী শুধু সমাজের হাতের পুতুল নয় তাদেরও স্বতন্ত্র সত্তা আছে। আদিলের প্রচন্ড মানসিক দ্বন্দ্ব ও পরে তা থেকে মুক্তির চিন্তা চরিত্রের এই বিশ্লেষণ তা অত্যন্ত সাবলীলভাবে কাব্যে প্রকাশিত হয়েছে। সমাজের ভাগ্যাহত এক সুন্দরী নারী প্রতি পলে পলে অপমানের তীব্র জ্বালায় জ্বলে খাঁটি সোনায় পরিণত হয়েছে। গরীব মা-বাবার ঘরে জন্ম বোধ হয় আজন্ম পাপ। তাই সারাটি জীবন যায় তার প্রায়শ্চিত্ত করতে। টাকার লোভে দাগী চোরের সাথে বাবা বিয়ে দেয় সকিনাকে কিন্তু সে বিয়ে টেকেনি। চোর স্বামীর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সে হাত বদল হয় নানা হাতে। লম্পট মৌলভী, গুন্ডা

ঠিকাদার সবার কাছে প্রকৃত আশ্রয়ের পরিবর্তে সবার কাছে বরং তাদের ভোগের সামগ্রী হয়েছে। তার আহত হৃদয়ের আর্তি-

কেউ দিল তারে বিষের ভান্ড, কেউ বা প্রবঞ্চনা,
কেউ দিল ঘৃণা, কলঙ্ক কালি এনে দিল কোন জনা।

[সকিনা, পৃঃ ২]

হরিণ তার নিজ মাংসের জন্য নিজেই নিজের শত্রু। চর্যাপদের এই অমোঘ বাণীটি সত্যি হয়ে ধরা দেয় সকিনার জীবনে। তার হৃদয়ের দুঃখ, কষ্ট, গ্লানি তার সুন্দর চেহারায় এতটুকু স্পর্শ করতে পারেনি। যেমন–

এত যে আঘাত, এত অপমান, এত লাঞ্ছনা তার,
সবই তার মনে, এতটুকু দাগ লাগে নাই দেহে তার।
দেহ যে তার পদ্মের পাতা, ঘটনার জল-দল,
গড়ায়ে পড়িতে রূপেরে করেছে আরো সে সমুজ্জ্বল।

[সকিনা, পৃঃ ২]

তার অপরূপ সৌন্দর্যের কারণে তাকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে বার বার। তারপর আদিলকে নিয়ে সুখের ঘর রচনা করার স্বপ্ন আদিলই তাকে দেখিয়েছিল। সে বড় আশা করে এসেছিল আদিলের কাছে। পেতে চেয়েছিল তার হৃদয়ের আসন-

সাক্ষী থাকিও আল্লা রসুল! আপন অনিচ্ছায়
সব চেয়ে যেবা পবিত্র মম তারে দিনু আমি হায়;
এই দেহ মন যাহা জনে জনে কালি যে মাখায়ে গেছে,
তাই নিল আজি মোর ফেরেস্তা আপনার হাতে যেচে।

[সকিনা, পৃঃ ৭]

সকিনা গরীব ঘরের সুন্দরী নারী হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ করার বিষয় তার কোন লোভ লালসা ছিল না, সে পরিস্থিতির শিকার। তাই সমাজের খারাপ লোকদের হাত থেকে তরুণ জমিদার আদিল যখন তাকে উদ্ধার করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চায় তখন সে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়নি। সকিনা চায়নি তার কলঙ্কময় জীবনের সাথে জড়িয়ে কেউ দুঃখের সাগরে গা ভাসাক-সে হাতজোড় করে আদিলকে বলেছিল-

"পায়ে পড়ি তব, শোন গো বন্ধু! ছাড় অভাগীর আশা,
আমারে লইয়া ভাঙিওনা তব আসমান সম বাসা।"

[সকিনা, পৃঃ ৬]

কিন্তু আদিল নাছোড় বান্দা, সে সকিনাকে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে তাই সকিনাকে স্বার্থপর হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়-

আদিল কহিল, "বুঝিলাম মেয়ে! রজনী হইলে শেষ,
রাতের বাসারে উপহাসি' পাখি চলে যায় আর দেশ;
সকল বিপদ হইতে তোমারে করিয়াছি উদ্ধার,
আমারে লইয়া তোমার জীবনে প্রয়োজন কিবা আর?"

[সকিনা, পৃঃ ৬]

সকিনা আদিলকে ভালবেসেছিল কিন্তু সেখানে কোন স্বার্থপরতা ছিল না-

"এত যদি মনে ছিল গো বন্ধু, এই অভাগিনী তরে,
তোমার পরাণ ওমন করিয়া এমনই যদি বা করে;
আমারে লইয়া এতই তোমার হয যদি প্রয়োজন,
আজি হতে তবে সঁপিলাম পায়ে এই দেহ আর মন।"

[সকিনা, পৃঃ ৭]

মনের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টির পর আদিল সকিনাকে ত্যাগ করে। সকিনার আশঙ্কা সত্যি হয়, সে জানত এই সমাজ তাকে সুন্দরভাবে বাঁচতে দেবে না। সে সমস্ত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে অবশেষে সন্তানের জন্ম দেয়। তার জীবন সার্থক হয় মাতৃত্বের মধ্যে। তবু মনের মধ্যে তার কষ্ট সৃষ্টি হয় নিজের জন্য নয়, তার সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে। মনে অদম্য ইচ্ছা সন্তানকে ভাল করে মানুষ করবে। তাই তিনু ফকিরের প্রশ্নের উত্তরে বলে–

আমি নারী অভাগিনী শত দোষ হায়,
কোলের ছেলে তোতা মনি না দেখল পিতায়।

[সকিনা, পৃ: ৫০]

সকিনার সাথে আদিলের সাক্ষাতের সময় পূর্বের সকিনার অনেক মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে। আদিল তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে চাইলে সে বলে-

"যেথায় মিথ্যা সম্মান আর খ্যাতি আর কুলমান,
প্রেম-ভালবাসা স্নেহ মায়া পরে হানিছে বিষের বাণ!
সেথায় আমার ঘর কোথা পতি? মোরে ছায়া দিতে হায়,
নাই হেন ঠাঁই রীতি নীতি ঘেরা তোমাদের দুনিয়ায়।
এ জীবনে আমি ঘরই চেয়েছিনু সে ঘরের মোহ দিয়ে,
কেউ নিল হাসি, কেউ নিল দেহ, কেউ নিল মন নিয়ে।
ঘর ত কেহই দিল না আমারে, মিথ্যা ছলনা-জাল,
পাতিয়া জীবনে নিজেরে ভুলায়ে রাখি আর কতকাল।"

[সকিনা, পৃ: ৬৭]

তার এই ঘোষণা ও আত্ম সম্মানবোধ তার চরিত্রকে মহিমান্বিত করে তুলেছে। শুধু তাই নয় তার চরিত্রের আর এক বড় দিক ত্যাগ। তার সুখ দুঃখের সাথী, তার একান্ত সম্পদ, আদরের ধন সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য তাকে আদিলের হাতে তুলে দিয়েছে-

"বড় আদরের মোর তোতা মনি তারে যাও সাথে নিয়ে,
আমারি মতন পালিও তাহারে বুকের আদর দিয়ে।"
এই কথা বলি অভাগী সকিনা ছেলেরে স্বামীর হাতে,
সঁপিয়া যে দিতে নয়নের জল লুকাইল নিরালাতে।

[সকিনা, পৃঃ ৬৯]

আদিলের প্রতি আহ্বান-

উদাস কণ্ঠে কহিল স্বামীরে, "ফিরে যাও, নিজ ঘরে।
মোদের মিলন বাহিরে হল না রহিল হৃদয় ভরে।
আমার লাগিয়া উদাসী হইয়া ফিরিয়াছ গাঁয় গাঁয়,
এই সান্ত্বনা রহিল আমার সম্মুখ জীবনটায়।"

[সকিনা, পৃঃ ৬৯]

আদিলের সাথে সকিনার চিরবিচ্ছেদের আগের মুহূর্তে আদিলের অনুরোধ ছিল যে কোথায় সকিনা ঘর বাঁধবে তা যেন জানায়। কিন্তু সকিনা এক অমৃতলোকের বাসিন্দা সে ঘরের সন্ধান পেতে হলে তাকেও অমৃতলোকে পৌছাতে হবে-

ম্লান হাসি হেসে কহিল সকিনা, "আমার মতন হায়,
অনেক সহিয়া ঘুমায়েছে যারা জীবনে ঝড়িয়ায়;
কবর খুঁড়িয়া বাহির করিয়া তাদের কাহিনী মালা,
বক্ষে পরিয়া প্রতি পলে পলে বুঝিব তাদের জ্বালা।"

[সকিনা, পৃঃ ৭১]

তাইতো সকিনা একান্ত মনে সেই মধুর সুরের সন্ধান করে-

"একান্ত মনে বসি ধ্যান মনে একটি একটি ধরি,
মোর ব্যথাগুলি সবার ব্যথার সঙ্গে মিশাল করি;
পরতে পরতে খুলিয়া খুলিয়া দিনের পরেতে দিন,
খুঁজিয়া দেখিব কোথা আছে সেই কথা অমৃতের চিন।
যদি কোন দিন সন্ধান মেলে, সে মধুর সুর নিয়া,
নতুন করিয়া গড়িব আবার আমাদের এ দুনিয়া।
সেই দিন পতি ফিরিয়া যাইব আবার তোমার ঘরে,
অভাগীরে যদি ভালবাস সখা, থেকো প্রতীক্ষা করে।"

[সকিনা, পৃঃ ৭২]

শেষ পর্যন্ত সকিনা অমৃতলোকে পৌছানোর তপস্যাতে রত। এই মনুষ্য গঠিতসমাজ নীতি তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। সে পরিবর্তন করবে এই মিথ্যা সমাজনীতিকে। প্রতিষ্ঠিত করবে প্রেম, সত্য, সুন্দরকে আর সেই দিন যতদূরে হোক সে সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাকবে। এর সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের রচয়িতাই যেন পরিবর্তন করতে চেয়েছেন এই সমাজ ব্যবস্থাকে। শেষ পর্যন্ত জসীম উদ্‌দীন সবার উপরে মানব সত্য এই বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করেছিলেন। সকিনা কাব্যের প্রধান চরিত্র সকিনা সুন্দর ও সার্থকভাবে চিত্রিত। দুঃখ স্রোতে, বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে জীবনের কন্টকাকীর্ণ বাসভবনে ফিরে ফিরে সকিনার চরিত্রে এসেছে ব্যক্তিত্বের আভিজাত্য ত্যাগের মহিমা। জসীম উদ্‌দীনের অপর দুটি কাহিনী কাব্যে নারীদের মধ্যে এই ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। সে দিক থেকে এই কাব্যটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী।

সকিনা কাব্যের প্রধান দুই চরিত্রের সঙ্গে তিনু ফকিরের চরিত্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সে অভাগী সকিনাকে তার মেয়ের মতো করে ঘরে নিয়েছে। যেমন-

"শোন শোন কন্না গো! আমি তোমার বাপ,
গামছার বাতাসে তোমার হরব মনস্তাপ।
ঠোঁটের আধার দিয়া তোমারে পালিব,
সাপের মাথার মনি কইরা তোমারে রাখিব।
সারিন্দা বাজাইয়া ফিরি তিনু ফকির নাম,
আমার সঙ্গে চল কন্না আমার গিরাম।"

[সকিনা, পৃঃ ২৩]

এই তিনু ফকির দুঃখ ক্লিষ্ট মানুষের কথা সারিন্দার সুরে বাজিয়ে তাদের নৈরাশ্য দূর করে। সকিনার দুঃখ কষ্টকে সে সারিন্দার সুরে সবাইকে জানিয়েছে যার দরুন সকিনা আদিলের মিলনের পথ কিছুটা সহজ হয়। তবে আপমর জনমানবের দরদী এই ফকির চরিত্র বিশিষ্টতা পেয়েছে তার স্পষ্টবাদিতার জন্য, দুখীর দুঃখে সমবেদনার জন্য। গ্রাম যখন বন্যাকবলিত হয়ে পড়ে তখন সে সবাইকে আশ্বস্ত করে গানের মাধ্যমেই-

"শহরে শুইনাছি আমি লোকজনের কাছে,
আমাগো গবর্ণমেন্টের লোক এই গাঁয়ে আসতাছে।
টাকা পয়সা অন্ন বস্ত্র ওষুধ পত্র আর,
আনত্যাছে মোদের তরে যা কিছু দরকার।"

[সকিনা, পৃঃ ৫৬]

সবাইকে নিয়ে সাহায্যের আশায় সে নগরবাসীদের দ্বারে দ্বারে ঘোরে–

"শোনগো নগরবাসী আজ্খী মেইলা চাও,
সপ্ত সাগর বেড়া দইনার সব তোমরা নাও।
তোমাগো খাইতে রহুক ষোড়শোপচার,
আমাগো দাও শুধু ক্ষুধার আহার।"

[সকিনা, পৃঃ ৫৮]

তিনু ফকিরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বন্যাকবলিত সকল অনাহারি তার পিছু নেয়-

এই বলিয়া তিনু ফকির গান গাহিয়া যায়,
অনাহারি শত লোকজন পিছে পিছে ধায়।
নগরিয়া যত লোকজন যেবা যাহা পারে,
টাকা পয়সা অন্ন বস্ত্র দেয় আইনা তারে।

[সকিনা, পৃঃ ৫৮]

অর্থাৎ এখানে তিনু ফকিরের চরিত্রের অন্য একটি দিক মানবমুখিতা। সে শত শত অনাহারিদের যেন দিক নির্দেশক। 'সকিনা' কাব্যের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে এ চরিত্রের বাস্তবতা। কাব্যের চরিত্রগুলোর মধ্যে যে দ্বান্দ্বিকতা তাই কাব্যটিকে বাস্তবতার দিকে নিয়ে গেছে। তাই কাব্যের নায়ক নায়িকা দুজনই জীবিত থেকেও 'সকিনা' কাব্য ট্রাজেডিতে পর্যবসিত, যা অন্য দুটি থেকে 'সকিনা' কাব্যকে পৃথক করেছে।

'মা যে জননী কান্দে'

কবি জসীম উদ্‌দীনের কাহিনী কাব্যগুলোর মধ্যে 'মা যে জননী কান্দে' সর্বশেষ রচনা। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। এটি তাঁর চতুর্থ কাহিনী কাব্য। তাঁর 'নক্সী-কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' এবং 'সকিনা' কাব্যের চাইতে এটি একেবারেই ভিন্নধর্মী রচনা। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে কিশোর-কিশোরীর প্রেম পরস্পরের আস্থা নির্ভর সেখানে প্রতিবন্ধকতা নিজেদের মধ্যে থেকে আসেনি। কিন্তু 'সকিনা' কাব্যে এসে কবি প্রথম রূঢ় কঠিন বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার প্রকাশ ঘটালেন। এখানে প্রেম আছে তবে সে প্রেম নর-নারীর জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে তাদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে। প্রেম এখানে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থেকে বিকশিত হয়েছে। আবার বাস্তবের নির্মম আঘাতে তা জর্জরিত। মূলত 'সকিনা' কাব্যে কবি 'সকিনা'র জীবনের যে সংকটাপন্ন রূপ দেখিয়েছেন তার প্রধান কারণ ছিল সকিনার জীবনের প্রারম্ভেই জটিলতম অবস্থা। সমাজের লম্পটদের হাতে লাঞ্ছিত অবস্থা থেকে স্বাভাবিক পথ চলার অধিকার তার ছিল না। সমাজ সংস্কারের বেড়াজালে ও মানসিক সংঘাতে আদিলের মন বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। এই কারণে তার ভাগ্যে নেমে এসেছিল ঘোর অমানিশা। তবুও একেবারে কাব্যের শেষে সকিনার প্রেমকে মহিমাময় প্রেমে রূপান্তর দেখিয়েছেন কবি। অর্থাৎ প্রেম এখানে সার্বজনীন রূপে ধরা দিয়েছে। 'সকিনা' কাব্যের সকিনা 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের সাজু বা দুলী থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। প্রেমের ক্ষেত্রে স্থান, কাল, পাত্র ও সমাজ স্বতন্ত্ররূপে স্থান পেলেও 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ও 'সকিনা' এই তিনটি কাব্যে মূলত একই প্রেমের রূপ চিত্রায়িত। কিন্তু 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে এসে কবি প্রেমের জটিল রূপ দেখাতে গিয়ে কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে পটভূমিরও পরিবর্তন

ঘটিয়েছেন। গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তে এখানে স্থান পেয়েছে শহরের জীবন। পল্লী জীবনের কিশোর-কিশোরীর যে প্রেম তার পূর্বের কাহিনী কাব্যগুলিতে দেখা যায় স্বাভাবিক কারণেই তা এখানে অনুপস্থিত। পল্লীর নির্মল আলো বাতাস, সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি যেমন এখানে নেই, তেমনি এই শহরের মানুষের ভেতরে অনুপস্থিত গ্রামীণ সরলতা। তাই 'মা যে জননী কান্দে' তাঁর তিনটি কাহিনী কাব্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

জসীম উদ্‌দীনের 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যেও পূর্বের কাহিনী কাব্যগুলোর মতো প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে পল্লীগীতি ও কবিতা বা ছড়া ব্যবহার করেছেন। এখানেও তিনি অধ্যায় বিভক্তির মাধ্যমে কাহিনী বিন্যস্ত করেছেন। বহিরঙ্গ বিশ্লেষণে দেখা যায় কাহিনী রচনা, চরিত্র চিত্রণ, ভাষা, ছন্দ সব দিক থেকে এ কাব্যটির ভেতরে পুরাতনের ছাপ অলক্ষণীয় নয়। পল্লী গান যেভাবে কাব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার কিছু নমুনা তুলে ধরা যায়। প্রথম অধ্যায়েই রয়েছে-

আমার খইসা পড়লো গলার হার,
বসন্ত কালরে আমার।

[কবি গানের ধূয়া- মা যে জননী কান্দে-পৃঃ ৯]

আবার বিচ্ছেদের গান-

মালির বাগিচায় ফুলের গাছটি,
ভোমর উড়িয়া পড়ে,
তুমি, সুজন দেখিয়া করিও পিরীতি,
মরিলে বাঁচাইতে পারে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ১২ বিচ্ছেদ গান]

প্রেমের রসবোধ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে জসীম উদ্‌দীনের পূর্বের তিনটি কাব্যের তুলনায় তাঁর 'মা যে জননী কান্দে' কাব্য পুরোপুরিই বাস্তব জীবনের মধ্যে নিবিষ্ট। সংঘাত ও দ্বন্দ্বময় জীবনের মধ্যে প্রেমকে ফেলে তিনি প্রতিনিয়ত এই কাব্যের নর-নারীকে এক জটিল পাকের মধ্যে ফেলেছেন। কাব্যের সারাংশ হল–শহরে বসবাসকারী এক নারীর অকুতোভয় বিদ্রোহী প্রেম, যা সমাজ সমর্থিত নয় তা কি করে সমাজের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয় এবং এই অপমানিত প্রেম শেষ পর্যন্ত সন্তানের জননী হয়ে জীবন যুদ্ধে জয়ী হতে চেয়েছিল। কিন্তু বাস্তবতার নিষ্ঠুর আঘাতে তার প্রাণপ্রিয় সন্তানকে ক্ষুধার করালগ্রাস থেকে রক্ষা করতে তুলে দিতে হয় এক মিশনারীর হাতে। নিজে বেছে নেয় এক চরম নিস্তব্ধতা নির্লিপ্ততার জীবন, তারই বিস্তৃত কাহিনী তাঁর 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে।

আমিনা সদ্য যৌবন প্রাপ্ত এক নারী, যে গরীব মা-বাবার সন্তান। এইরূপ যৌবনের কারণেই তার পাড়ায় টেকা দায় হয়ে ওঠে। প্রতিনিয়ত পাড়া প্রতিবেশীরা শুভাকাঙ্খির রূপ ধরে আমিনার মাতা-পিতার কাছে আসে। এতে আমিনার গরীব বাবা-মা উপায়ান্তর না দেখে এক আশি বছরের বৃদ্ধ জমিদারের সাথে তাকে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। আমিনার বাঁধনহারা যৌবন কিছুতেই বাঁধ মানতে চায় না। এই বৃদ্ধ জমিদার তাকে সন্তানের জননী করতে ব্যর্থ। কিন্তু মিথ্যা সমাজ নীতির বেড়াজাল আমিনা মেনে নিতে চায়নি। তাই সমাজের সমস্ত নিয়মনীতি অতিক্রম করে সে বৃদ্ধ জমিদারের যুবক ড্রাইভারের প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ঘর ছেড়ে পাড়ি দেয় দূর কলকাতার এক নোংরা বস্তিতে। কিন্তু সমাজের নিয়মনীতিকে অগ্রাহ্য করে বেশি দিন এভাবে থাকা সম্ভব না তা আমিনা বুঝতে পারেনি। সে তরুণ ড্রাইভার স্বামীকে নিয়ে স্বপ্নে বিভোর। স্বপ্ন সুখে ঘর বাঁধার, স্বপ্ন তার আদর জড়ানো এক কচি মুখের প্রিয় সন্তানের। কিন্তু তার স্বপ্ন পূরণ হতে পারেনি। সমাজের ভয়ঙ্কর নিয়ম ও

শাসনের ভয়ে আমিনার যুবক স্বামী গর্ভবতী অবস্থায় তাকে ফেলে চলে যায়। এদিকে বৃদ্ধ জমিদার মানসম্মান রক্ষার্থে স্ত্রীকে মৃত বলে আমিনার বাবা-মার কাছে খবর পাঠায়। এদিকে তরুণ স্বামী পরিত্যক্ত আমিনার জীবনে নেমে এল ঘোর অমানিশা। আমিনার জীবনে শুরু হলো সমাজের নিয়ম ভাঙার অভিশাপ। কারণ সমাজের ভয়ে তার বাবা চরিত্রহীন কুলটা বলে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল–

"কুলটা কন্যারে তুই কোনবা সাহস পেয়ে,
আইলি আমার ঘরে কুলের মাথা খেয়ে!
ধোপ কাপড়েতে তুই লাগাইলি দাগ,
মাথার ছাতিতে তুই লাগাইলি আগ,
আসমান সম বংশের বাতি তাতে দিলি কালি,
সোনার সেতারা যন্ত্রে বাজাইলি গালি!"

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ৩৬]

অভুক্ত আমিনা আশ্রয়ের আশায় পথে পথে ঘুরে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পায় এক বৃদ্ধ কৃষক-কৃষাণীর ঘরে। এই বৃদ্ধ চাষী দম্পতির অকালমৃত কন্যার স্থান নেয় আমিনা। আমিনাকে পাওয়ার পর কৃষক-কৃষাণীরও আনন্দের সীমা নেই, তারা পিতৃ-মাতৃ স্নেহে আমিনাকে আশ্রয় দেয়। আমিনা অশান্ত জীবনে স্বস্তি পায়। তার কোলে জন্ম নেয় এক ফুটফুটে সন্তান যা তার অতীতের সব দুঃখ-কষ্ট গ্লানি মুছে দেয়। আমিনা জননীরূপে নতুনভাবে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে।

এই জননী হওয়ার আশায় নারী জন্ম সার্থক করতেই সে বৃদ্ধ জমিদারের গৃহ থেকে পালিয়ে এসেছিল। কিন্তু জীবনে পরিপূর্ণ স্বস্তি আসার আগেই আমিনার আশ্রয় দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস কেড়ে নেয়। আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ কৃষক-কৃষাণী ক্ষুধার জ্বালায়, অন্ন

সংস্থানের আশায় শহরের প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে অবশেষে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তখন একদিকে নিজের ক্ষুধার জ্বালা অপরদিকে সন্তানের ক্ষুধার কষ্ট দুয়ে মিলে তার হৃদয় রক্তাক্ত হয়। কোথাও একটু অন্নের সংস্থান মেলে না। তবু সে হাল ছেড়ে দেয়নি। নিজ সন্তানকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে দেয়নি। সারা জীবনের মতো সন্তানকে তুলে দেয় এক মিশনারী সাহেবের হাতে। সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিঃশর্তভাবে তাকে অন্যের হাতে তুলে দেয়।

জগতের প্রতিটি মায়ের একান্ত চাওয়া তার সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ। 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে আমিনাও চেয়েছিল সন্তানের নিরাপদ জীবন। যে সন্তানের জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করেছে সমাজের বিরুদ্ধে, পরিবেশের সঙ্গে, বৃদ্ধ জমিদারের বাড়ি গাড়ি সব ছেড়ে বস্তির নোংরা পরিবেশে নির্বিঘ্নে থেকেছে, সেই প্রাণপ্রিয় সন্তানের বেঁচে থাকার জন্য দুর্ভিক্ষের মৃত্যুছোবল থেকে রক্ষা করার জন্য সন্তানকে অন্যের হাতে তুলে দিতেও দ্বিধাগ্রস্থ হয়নি। আমিনার এই ত্যাগের কাছে দুর্ভিক্ষ পরাজিত হয়েছে। আমিনা তার জীবনের একমাত্র অবলম্বনকে মিশনারী সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে শোকে পাগল হয়ে গিয়েছিল। একদিকে দুর্ভিক্ষ অপর দিকে চিরজীবনের মতো সন্তান অন্যের হাতে তুলে দেয়া এই দুই অবস্থায় আমিনার হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে। আমিনার একটাই সান্ত্বনা সন্তানকে জীবিত রাখার প্রচেষ্টা–

"যাও যাও তবে যাওগো সাহেব আমার বাছারে লয়া,
বেঁচে থাক তবু বেঁচে থাক ছেলে লয়ে তোমাদের ময়া।"
আপন হস্তে ছেলেরে তাহার দিয়ে সাহেবের হাতে,
ফিরিয়া চলিল অভাগী আমিনা জনহীন একা রাতে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ৫৮]

'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে কবি গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তে শহুরে জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে নর-নারীর চারিত্রিক পরিবর্তনও ঘটিয়েছেন। এই কাব্যের নর-নারীরা অনেক বেশি পরিমাণে বাস্তব জ্ঞান সমৃদ্ধ। তারা গ্রামের সহজ-সরল পল্লী কিশোর-কিশোরী নয়। শহরের ইট কাঠের মতো তাদের হৃদয়ও কঠিন। কাব্যের শুরুতেই কাব্যের নায়িকা আমিনা চরিত্রের আবির্ভাবের মধ্যে দিয়ে সুকৌশলে কবি শহরের পরিবেশের কথা তুলে ধরেছেন। দুটি চরণের মধ্যে তা ধরা পড়ে–

কুট্টির মেয়ে আমিনার কথা কে আর শুনিতে চায়,
নভেলের কোন কাহিনী হয় না তার কোন ঘটনায়!

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ৯]

কুট্টির মেয়ে আমিনার প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায় তা ঢাকা শহরের কোন এলাকার কথা। আবার পাড়াপ্রতিবেশি নিত্য নতুন বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আসে আমিনাদের বাড়িতে। প্রতিবেশি আজিমের নানি তার নাতির সঙ্গে আমিনার বিয়ের কথা পাড়ে-

আজিম তাহার রেসের খেলায় রোজ বাজী জিতে আসে,
ঘোড়ার গাড়ির কোচওয়ানী করে বহু টাকা পায় মাসে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ১২]

ঘোড়ার রেস খেলা শহরের উল্লেখ করা হয়েছে। আমিনার বৃদ্ধ জমিদার স্বামী যে সিলেট শহর থেকে আগত তার বর্ণনা নিচের চরণ দুটিতে প্রাপ্য–

শুভ দিনে শুভক্ষণে আজ আমিনার বিয়ে,
সিলেট থেকে বর আসিল ঢোলে টোপর দিয়ে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ১৬]

ড্রাইভারের হাত ধরে যখন সে পালিয়ে যায় তখন ড্রাইভার তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে কলিকাতার ছোট ঘরের-

"জন-অরণ্য দূর কলিকাতা, আড়াল রচিয়া তার,
ছোট ঘরখানি গড়িব আমরা ফুল ফুটাইব আর।"

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ২৩]

আমিনা গরিব ঘরের কুট্টির মেয়ে তার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সে অন্ধ পতিভক্তি নিয়ে বৃদ্ধ জমিদারের সাথে সংসার করেনি। সে জানে এই জমিদার স্বামীর ছায়া থেকে চলে গেলে তার ভাগ্যের কী পরিণতি ঘটবে। বৃদ্ধ জমিদার স্বামী তাকে সন্তানের জন্মদানে ব্যর্থ। তাই সেই সম্পর্ককে তুচ্ছ করে, সে এগিয়ে গিয়েছে নিজের নারীত্বের সার্থকতা ঘটাতে। এখানে তার সাহসিকতার পরিচয় আছে। অর্থাৎ আমিনা ছিল আত্ম সচেতনবোধ সম্পন্ন নারী। তাই সমাজের নিয়মের বেড়াজাল ভেঙে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সে জননী সত্তার সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছে। প্রচণ্ড মনোবল, আত্মবিশ্বাস না থাকলে আমিনার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব ছিল না।

কাব্যের মুখবন্ধে কবির উক্তি-"ইহা কাহিনীকাব্য। ইহার প্রত্যেকটি লাইনে কেহ যেন কবিত্ব আশা না করেন। এই কাব্যে বর্ণিত চরিত্রগুলি যদি জীবন্ত হইয়া পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, তবেই বুঝিব আমার লেখা সার্থক হইয়াছে।"

জসীম উদ্‌দীনের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে যদি এই কাব্যের চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে বলতে হয় কবির কামনা অসম্পূর্ণ থাকেনি। কারণ কাব্যের প্রতিটি চরিত্র বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয় প্রধান চরিত্র আমিনার হৃদয়বিদারক পরিণতি উপলব্ধি করে পাঠক হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে।

আমিনার পালানোর ঘটনা সমাজের চোখে অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হলেও কবি তার এই চলে যাওয়াকে সেভাবে দেখেননি। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে গোবিন্দলালের সঙ্গে রোহিনীর সমাজ বহির্ভুত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি বলে রোহিনীকে প্রাণ ত্যাগ করতে হয়। কবি আমিনাকে সামাজিক নীতিবাদীর চোখে দেখেননি, দেখেছেন এক মরমী শিল্পীর চোখে। তাই চরিত্রস্খলন সত্ত্বেও আমিনাকে এক উজ্জ্বল নারী-সত্তা রূপে উপস্থাপন করেছেন জননী সত্তার বিকাশ ঘটিয়ে।

জসীম উদ্‌দীন তাঁর 'নক্সী-কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ও 'সকিনা' কাব্যের মত 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যেও চরিত্র সৃষ্টিতে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন। এই কাব্যের প্রধান ও অপ্রধান প্রতিটি চরিত্র জীবন্ত রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে ধরা দিয়েছে। কাব্যের শুরুতেই আমিনার ভাগ্য বিড়ম্বিত হওয়ার আভাস কবি দিয়েছেন। সুন্দরী নারী আমিনার অভাব ছাড়ে না আর সেই সঙ্গে পাড়া প্রতিবেশীদের গুঞ্জনের শিকার হয় সে।

তাহারে লইয়া পাড়া পড়শীর ঘুম নাই চোখে আর-
আমিনার মাতা, মেয়ের তোমার চোখে না বাড়?

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ১২]

উপয়ান্তর না দেখে আমিনার বাবা মেয়েকে আশি বছরের বৃদ্ধ সিলেট জেলার জমিদার রহিম মিঞার সঙ্গে বিয়ে দেয়-

বয়স বরের আশির কাছে তিনটি যে বউ ঘরে,
মুহূর্তে কে দেখল না কেউ সে-সব মনে করে।
আমিনাও ভাবল নাকো, বিয়ের সাজন গায়ে,
এক গাঁ হতে চলে গেল, অজানা এক গাঁয়ে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ১৬]

বিয়ের দুই এক দিন পরই আমিনার মন বিষিয়ে ওঠে। কোথায় যেন এক শূন্যতা তাকে ঘিরে রাখে। এত ধন-দৌলৎ চাকচিক্য কোন কিছুতেই তার মন ভরে না-

তবু আমিনার মন ভরে নাকো বাহিরের চাক্‌চিক্‌,
ঝলসিয়া যেন আঁধার করিছে তাহার সকল দিক।
ফুল শয্যার বাসর তাহার নিতুই রচিত হয়,
নিতুই নতুন ভূষণে বসনে অঙ্গ জড়ায়ে লয়।

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ২০]

বৃদ্ধ স্বামী তার সঙ্গে খানিকক্ষণ আলাপচারিতার পর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে-

বুড়ো জমিদার কয়েক ঘন্টা বকর বকর করে,
শিথিল দেহটি এলাইয়া দেয় অলস ঘুমের ভরে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ২০]

আমিনা বুঝতে পারে এই নিষ্ঠুর সমাজ তার মতো সদ্য রূপযৌবনপ্রাপ্ত এক নারীকে আশি বছর বয়সের এক বৃদ্ধের হাতে তুলে দিয়ে তাকে বঞ্চিত করেছে নারীত্বের

স্বাভাবিক অধিকার থেকে। তাকে নিয়ে এত বড় প্রবঞ্চনা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সে ভেতরে ভেতরে ক্রমশ বিদ্রোহের দাবানলে তৈরী হয়। এই ব্যর্থতা, এই উপহাস থেকে পরিত্রাণের পথ খোঁজে। এই শৃঙ্খল ভাঙতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। তার বিদ্রোহী প্রাণ ঘোষণা করে–

এই কারাগার ভাঙ্গিতে হইবে, এই মিথ্যার ভান,
তিলে তিলে আজ দগ্ধ করিছে তাহার নারীর প্রাণ।

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ২১]

আমিনার ভেতরে ছিল বন্দিশালা থেকে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং পথও সে পায়। আর তাই চিন্তার অবকাশ না দিয়ে জমিদারের তরুণ ড্রাইভারের প্রেমের ইশারায় সাড়া দিতে দ্বিধা করে না-

জমিদারের বাড়ির ড্রাইভার সে যে শিস্ দিয়ে দিয়ে চলে,
উঠতে বসিতে হেলিতে দুলিতে কোন গান যেন বলে।
বাঁশিতে বাজায় ভাটিয়ালী সুর একেলা নিঝুম রাতে,
তাহারে সে যেন যাচনা করিছে আপনার নিরালাতে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ২৩]

আমিনা এই তরুণ ড্রাইভারকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে সুখের ঘর রচনার। সে জানে এই পথ কন্টকাকীর্ণ। সেখানে অভাব নিত্যসঙ্গী হবে কিন্তু তবু সে বিচলিত হয় না। সে স্বপ্নের জাল বোনে, তার ঘরে আসবে শিশু সন্তান–

ছোট সে শিশুটি, তাহারি কামনা-তাহারি স্বপন হয়ে,
ফুটিয়া উঠিবে আঁচলের কোণে মমতা মূরতি লয়ে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ২৩]

স্বপ্নে বিভোর আমিনা ড্রাইভারের হাত ধরে দূর কোলকাতার এক নোংরা বস্তিতে আশ্রয় নেয়। সেখানে পায়রার খোপের মতো ঘর, গন্ধে এতটুকু নিঃশ্বাস নেয়ার জায়গা নেই–

তবু আমিনার ইহাই স্বর্গ, ড্রাইভার পতি নিয়া,
ছোট-খাট দিন কেটে যায় তার নানা কাজ আগুলিয়া।
[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ২৫]

ছোট শিশুর স্বপ্নে আচ্ছন্ন আমিনা প্রতিদিনই ছোট ছোট জামা কাপড়ের জিনিস তৈরী করে। কিন্তু সে বুঝতে পারে না তার এই সমাজ বহির্ভূত প্রেম অশনি সংকেত হয়ে ধেয়ে আসছে তার জীবনকে লন্ডভন্ড করে দিতে। তাই সে প্রথম আঘাত পায় তার প্রেমিক স্বামীর কাছ থেকে। সন্তান সম্ভবা আমিনা তার বহুদিনের কাঙ্খিত এই সন্তানের কথা স্বামীকে জানানোর পর স্বামীর উক্তি–

"কি কথা শুনালে অভাগী আমিনা! কি কথা শুনালে আজ,
তোমার কথায় আকাশ হইতে নামিয়া আসিল বাজ।
তোমার বুকেতে যে শিশু আসিছে, সাক্ষী হইয়া হায়,
মোদের যত না গোপন কাহিনী ঘোষিবে সকল ঠাঁয়।"
[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ২৮]

যে শিশুর কামনায় সে সমাজ শাসনকে তুচ্ছ জ্ঞান করছে সেই সন্তানের আগমন এমন নিষ্ঠুর কথায় অভিব্যক্ত হবে আমিনা তা কল্পনা করেনি । এই কথা শোনার পর তার অন্তঃকরণ যেন অবশ হয়ে পড়ে–

এই কথাগুলি তীর হয়ে যেন অন্তর পথ ধরি,
তাহার বুকের অদেখা শিশুরে গেল বিক্ষত করি।

প্রতি রোমে রোমে রয়ে রয়ে সে যে চিৎকার করি কাঁদে,
তার সারা বুক শিহরি উঠিছে, শিশুর আর্তনাদে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ২৮]

তার স্বামী এই সন্তানকে নষ্ট করে দিতে বলে–

আদেশের সুরে তাহারে ডাকিয়া ড্রাইভার কহে,
'এই ঔষধ লয়ে'
এখনি খাইবে, খোদার রহমে কিছুক্ষণ পরে
যাইবে খালাস হয়ে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ৩১]

এই উক্তির পর সে গর্ভবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যায়। আমিনা সন্তানকে কিছুতেই হত্যা করতে পারে না-

তবু তাই হোক, নিলাম বাছারে আপনার হাতে
সে দুখ দহন জ্বালা,
তোর তরে হোক কচি রোদ-রেখা নতুন বিহানে
রঙিন ফুলের মালা।

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ৩২]

আমিনা সাহসী নারী। সমাজের সঙ্গে, সংসারের সঙ্গে সবার সঙ্গে বিদ্রোহ করে সে তার শিশু সন্তানকে নতুন সকালে আমন্ত্রণ করে আনে। এখান থেকেই শুরু হলো আমিনা চরিত্রের ট্র্যাজেডি। দিনের পর দিন অপেক্ষা করে সে যখন বুঝতে পারে যে তার স্বামী আর ফিরবে না তখন সে বস্তি ছেড়ে মা-বাবার ঘরে ফিরে। বৃদ্ধ জমিদার

নিজের মান-সম্মানের কথা বিবেচনা করে আমিনার মৃত্যু হয়েছে এই সংবাদ তার পিতা-মাতার কাছে পাঠিয়েছিল। এতদিন পর সন্তানকে জীবিত পেয়ে আমিনার মা আহ্লাদে ফেটে পড়ে কিন্তু সব কথা শুনে তার বাবা তাকে কুলটা বলে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। আমিনার বাবা সমাজের ভয়ে মেয়েকে ঘরে তোলেনি কিন্তু সে তার বাবাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়েছে বাবা মিথ্যা সমাজ নীতির বেড়াজালে আবদ্ধ-

"সোনা-রূপায় বাপজান গো দুই মুঠ ভরে,
আমারে বেচিয়াছিলে বড় লোকের ঘরে।
আশি বছরের বর আমার মরার সমান,
তারির সনে বাইন্দা দিলা আমার পরাণ।
তখন তো হয় নাই বাপজান, কুলের অখ্যাতি,
তখন তো নেবে নাই তোমার সুনামের বাতি।"

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ৩৭]

এখানে আমিনা চরিত্রের আর একটি দিক উন্মোচিত। সে তার অবস্থার জন্য যেমন সমাজকে দায়ী করেছে তেমনি তার পিতা যে অর্থের লোভে তাকে বৃদ্ধের হাতে তুলে দিয়েছে এই কথাও সে স্পষ্ট তার পিতাকে জানিয়েছে অকুতোভয়ে।

ভাগ্যাহত আমিনা বাবার কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে বৃদ্ধ কৃষক-কৃষাণীর ঘরে আশ্রয় পায়। সেখানে ভুমিষ্ট হয় তার কাঙ্খিত সন্তান। কিন্তু গ্রামে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। গ্রামের মোড়লের প্রতিনিধির সঙ্গে আমিনাও ঢাকা শহরে আসে। কিন্তু অন্ন মেলে না। অবশেষে সে সন্তানকে এক মিশনারী সাহেবের হাতে সমর্পণ করে। সমাজের রক্তচক্ষুকে ভয় না করে সে তার নারী সত্তার বিকাশ ঘটিয়েছে এবং সন্তানকে পৃথিবীতে এনে তাকে ভাল রাখার জন্য সংগ্রামও আমিনা করেছে। প্রতিবাদী এক

নারী অর্থাৎ আমিনা সংগ্রামী নারীর প্রতীক। কিন্তু আমিনা সন্তান-বিরহ সহ্য করতে পারেনি। সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সারা অঙ্গে ছেলের অস্তিত্ব অনুভব করে-

এখনো ছেলের গায়ের ওম যে লাগিয়া রয়েছে বুকে,
যাদুরে আদরি যে চুমা দিয়াছে আঁকিয়া রয়েছে মুখে।
নাই নাই ওরে বুকের বাছনি, নাই নাই মা'র কোলে,
আর ডাকিবে না মধুমাখা সেই মা বোল তাহারে বলে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ৫৮]

উন্মাদ আমিনা কোলের সন্তানকে হারিয়ে পথে পথে সন্তানকে খোঁজে-

"এনে দাও তারে, এনে দাও কোলে একটু বেলম হলে,
তোমাদের ঘরে আগুন লাগায়ে যেথা খুশি যাব চলে।
অমার যাদুরে কেড়ে নেছ যদি, তোমাদের কোল হতে
শিশু সন্তানে ছিনাইয়া নিয়ে আছড়াব পথে পথে।"

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ৬০]

আমিনার হাহাকার পাঠককে তার প্রতি সমব্যথায় ব্যথি করে তোলে। 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে আমিনার চরিত্রের ট্র্যাজিক পরিণতি সুপরিকল্পিত। প্রধান চরিত্র ছাড়াও অপ্রধান কতকগুলি চরিত্র নির্মিত হয়েছে দক্ষতার সঙ্গে। যেমন আমিনার প্রেমিক তরুণ ড্রাইভার। আমিনাকে প্রেমের স্বপ্ন দেখিয়ে সে তাকে নিয়ে আসে বস্তিতে কিন্তু আমিনা সন্তান সম্ভবা হয়ে পড়লে তাকে ফেলে চলে যায়-

ড্রাইভার পতি সেই যে গিয়াছে আর আসিল না ফিরে,
দারুণ দুখের কালো সে নাগিনী আমিনারে নিল ঘিরে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ৩৩]

জমিদারের চর তাদের খুঁজছে এই দোহাই দিয়ে তার স্বামী আমিনার সন্তান নষ্ট করার জন্য ঔষধ এনে দেয় এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে স্বার্থপরের মতো, ভীরু কাপুরুষের মত প্রথম সুযোগেই পালিয়ে যায়। এখানে এই চরিত্রটি সমাজের একটি টাইপ চরিত্র। এই জাতীয় চরিত্র সব সময় নিজের সুবিধামত কাজ করে। আমিনার পিতার চরিত্র স্বাভাবিক, কারণ গরিব পিতা সমাজের ভয়ে সব সময় ভীত। দীর্ঘদিন পর মেয়েকে ফিরে পেয়েও তাকে কাছে টানতে না পেরে বাড়ি থেকে বের করে দেয়-শুধু তাই নয় আমিনা তার বাবাকে বৃদ্ধের হাতে তুলে দেয়ার জন্য দায়ী করলে সে প্রচন্ড ক্রোধে ফেটে পড়ে –

"কি কইলি কলঙ্কী কন্যা! কি শুনাইলি কানে,
তীক্ষ্ম বরশার তীর লাগাইলি পরাণে।
গোস্বায় জ্বলিছে মোর মাটি দুনিয়ায়,
গোস্বায় জ্বলিছে মোর মজিদ মক্কার;
যেখান হইতে আইছাস তুই সেথায় চইলা যা,
আর যেন না শুনি তোর পাপ মুখের রা;
দোহাই তোর আল্লা নবীর দোহাই বাপ-মা'র,
তিলেক মাত্র বিলম্ব তুই না করিবি আর।"

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ৩৭-৩৮]

'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে আরো একটি উজ্জ্বল চরিত্র আমিনার মা। মেয়েকে কাছে পেয়ে সে আবেগে আপ্লুত কিন্তু আমিনার বাবার জন্য সে আমিনাকে ধরে রাখতে পারেনি তাই তারও মাতৃহৃদয় সমাজ শাসনকে অগ্রাহ্য করে স্বামী সংসার ফেলে ছুটে যায় মেয়ের উদ্দেশ্যে–

"কিসের কুল, কিসের সমাজ, তারও মুখে ছাই,
যেইখানে মায়ের বুকে কন্যার নাহি ঠাঁই।
রইল তোমার ঘরবাড়ি, রইল জ্ঞাতিজন,
যে পথে আমিনা গ্যাছে সেথা করিব গমন।"

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ৩৮]

সব কিছুকে অতিক্রম কর এখানেও মাতৃত্বের জয় ঘোষিত হয়েছে। স্বল্প পরিসরে হলেও আমিনার মায়ের চরিত্র পরিস্ফুট। পরিশেষে যে চরিত্রটি সবার কাছে লক্ষ করার মতো তা হোল ধর্মযাজক মিশনারী সাহেব। যিশুভক্ত মিশনারী সাহেব আমিনার সন্তানকে নেয় ধর্মকর্মের জন্য। সারা জীবনের জন্য একজন মা তার সন্তানকে তুলে দেয় তার হাতে, পরিবর্তে একটু চোখের দেখা দেখতে চায়, সান্ত্বনা পেতে চায়, কিন্তু মিশনারী সাহেব নির্দয়। তাই ছেলে বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে মাকে চিনতে পারবে কিনা এমন আশঙ্কা–

"সত্যি সাহেব! বাছনি আমার খুব লেখাপড়া শিখে,
হাকিম হইবে, সুখ্যাতি তার ছড়াইবে যে দিকে দিকে!
ঘর-আলো করা বউ হবে তার গাড়ি ঘোড়া কত আর
তখন সে কি গো সন্ধান নাহি লবে এ অভাগী মা'র।"

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ৫৭]

কিন্তু উত্তরে এই নিষ্ঠুর মিশনারী বলে–

"ও সব তাহারে জানিতে দিবনা, কেবা ছিল পিতা-মাতা,
চির জনমের মতো তার তরে মুছে দেব সেই খাতা।"

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ৫৭]

জসীম উদ্‌দীন তাঁর প্রতিটি কাহিনীকাব্যে চরিত্রগুলি বাস্তব রস সমৃদ্ধ করে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর আনুবীক্ষণিক মন ও সূক্ষ্ম বিবেচনা যেমন কাহিনীকে সার্থকতা দান করেছে তেমনি তাঁর চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতাও অসাধারণ। এই চরিত্রের উজ্জ্বলতা ও শিল্প সফলতা কাব্যের মধ্যে এক সুন্দর আবেদন সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়
জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যের কাহিনী গ্রন্থনের বৈশিষ্ট্য

জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যের কাহিনী গ্রন্থনের বৈশিষ্ট্য

নক্সী-কাঁথার মাঠ :

জসীম উদ্‌দীন কাহিনীকাব্যের বিষয়, প্রকৃতি ও কাহিনী বর্ণনায় কুশলী শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কাব্যের বিষয় পল্লীর উপাদান, যা পল্লীর চারপাশের সব কিছুকে কেন্দ্র করে গঠিত। কাহিনীর ক্ষেত্রে প্রেম ও ট্রাজেডি কাব্যকে রসঘন করে তুলেছে। জসীম উদ্‌দীনের কাহিনী কাব্যগুলি বাস্তবরূপ সম্পন্ন। পল্লীর প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ হাসি কান্না একত্রিত হয়ে তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। তাঁর কাহিনীকাব্য গ্রন্থনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা কতকগুলো স্তরে বিন্যস্ত এবং যা স্ত রে স্তরে সন্নিবেশিত হয়ে একটি সুন্দর মালার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর প্রথম কাহিনীকাব্য 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' পর্যালোচনায় দেখা যায় এর প্রথম স্তর সাজু-রূপাইয়ের কৈশোর জীবনের প্রেম। পাশাপাশি অবস্থিত দুটি গ্রাম ভাইয়ের মত অবস্থান করলেও এই দুই গ্রামের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল না। তবু রূপাই ও সাজু পরস্পরের প্রেমে পড়ে। জসীম উদ্‌দীন অত্যন্ত নিখুঁতভাবে দুই গ্রামের কিশোর-কিশোরীর প্রেম ও গ্রাম দুটির ভেতর যে অসদ্ভাব বিদ্যমান তা কাব্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন–

এ-গাঁর চাষী নিঘুম রাতে বাঁশের বাঁশীর সুরে,
ওইনা গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুরে!
এ-গাঁও হতে ভাটীর সুরে কাঁদে যখন গান,
ও-গাঁর মেয়ে বেড়ার ফাঁকে বাড়ায় তখন কান।
এ-গাঁও ও-গাঁও মেশামেশি কেবল সুরে সুরে;
অনেক কাজে এরা ওরা অনেকখানি দূরে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ১০]

তাদের মধ্যে অসদ্ভাবগুলো কবির ভাষায় নিম্নরূপ-

এ-গাঁর লোকে দল বাঁধিয়া ও-গাঁর লোকের সনে,
কাইজা ফ্যাসাদ করেছে যা জানেই জনে জনে।
এ-গাঁর লোকও করতে পরখ্ ও-গাঁর লোকের বল,
অনেক বারই লাল করেছে জলীর বিলের জল।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ১২]

তাদের প্রেমের ক্ষেত্রে বাধা আসে বাইরে থেকে। তাদের ভালবাসা পরিণয়ে না পৌছানো পর্যন্ত সাজু-রূপাই দুজনকেই শুনতে হয়েছে নানা কটু কথা। তার আগে দুজনের প্রেমের পূর্বরাগ ও পরে প্রথম প্রেমের পত্র পল্লব বিকশিত হয়ে দুজন আছন্ন-

এমনি করিয়া দিনে দিনে যেতে দুইটি অরুণ হিয়া,
এ উহারে নিল বরণ করিয়া বিনে-সূতী মালা দিয়া।
এর প্রাণ হতে ওর প্রাণে যেয়ে লাগিল কিসের ঢেউ,
বিভোল কুমার, বিভোল কুমারী, তারা বুঝিল না কেউ।
তারা বুঝল না, পাড়ার লোকেরা বুঝিল অনেক খানি,
এখানে ওখানে ছেলে বুড়ো মিলে শুরু হল কানাকানি।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৩১]

রূপাই-সাজুর নিষ্কলঙ্ক প্রেমে কালিমা লেপন করে গ্রাম্য কুটনী বুড়িরা। তাই আর দেরি না করে রূপাই এর মা দুখাই ঘটকের মাধ্যমে সাজুদের বাড়িতে প্রস্তাব পাঠায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয় প্রথম স্তরের কাহিনী-

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

"ও রূপাই, তুই কোথায় গেলি? ভাবিস্ নাক মোটে,
কপাল গুণে বিয়ে যে তোর সাজুর সাথেই জোটে!"
এই বলিয়া রূপার মাতা ছুটল গাঁয়ের পানে,
ঘটক গেল নিজের বাড়ি গুণ্-গুণা-গুণ গানে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৪২]

কাব্যের কাহিনীর দ্বন্দ্ব উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হয়েছে। এই কারণে কাহিনী অসংলগ্ন বলে মনে হয় না, বরং প্রতিটি স্তর যেন এক একটি ফুল আর এই সবগুলি ফুল যোগে তৈরী হয়েছে এক নান্দনিক মালা। প্রতিটি স্তরে কাহিনীর চরিত্র চিত্রণ ও গঠনে রয়েছে একটি সুসমঞ্জস পরিকল্পনা। যার ফলে একটি স্তরের শেষে যখন আর একটি স্তর আরম্ভ হয় তখন অনুধাবন করা যায় যে এর পরবর্তী স্তরটি কোন পর্যায়ে উন্নীত হবে। প্রথম স্তরে কিশোর-কিশোরীর প্রেমের একটি পরিণতির আভাস পাওয়া যায় এর দ্বিতীয় স্তরে। স্বভাবতই বোঝা যায় দ্বিতীয় স্তরে সাজু-রূপাই এর ভালবাসা সার্থক হবে অর্থাৎ বিয়ের মাধ্যমে তা পরিণতি লাভ করবে।

দ্বিতীয় স্তরঃ সাজু-রূপাই এর বিয়ে ও এই বিয়েতে গ্রামীণ রীতি অনুযায়ী চম্পা, কালুগাজী, সোনাভানের পুঁথি পাঠ করা হয়। আবার ছেলের বাড়ি থেকে যে উপঢৌকন পাঠানো হয় তা মেয়ের বাড়িতে পছন্দ না হলে তা নিয়ে নানা কথা হয়। এ ছাড়া আছে কিছু লোকাচার। যেমন–

449910

এমন সময় শোর উঠিল বিয়ের যোগাড় কর,
জলদি করে দুলার মুখে পান শরবত ধর।
সাজুর মামা খটকা লাগায়, বিয়ের কিছু গৌণ,
সাদার পাতা আনেনি তাই বেজার সবার মন।

রূপার মামা লম্ফে দাঁড়ায় দম্ভে চলে বাড়ি;
সেরেক পাঁচেক সাদার পাতা আন্‌ল তাড়াতাড়ি।
কনের খালু উঠিয়া বলে "সিঁদুর হল ঊনা।"
রূপার খালু আনিয়া দিল যা লাগে তার দুনা!

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৪৫]

সব কিছু ঠিকঠাক এনে দিলেও যখন কনে পক্ষের মনের মত হয় না তখন বরপক্ষও ছেড়ে কথা বলে না-

কনের চাচার মন উঠে না, "খাটো হয়েছে শাড়ী।"
রূপার চাচা দিল তখন 'ইংরেজী বোল ছাড়ি"।
"কিরে বেটা বকিস নাকি?" কনে চাচা হাঁকে,
জালি কলার পাতার মত গা কাঁপে তার রাগে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৪৫]

বিয়ে বাড়িতে বরকনেকে ক্ষীর ভোজন করায় এয়োরা, এটি একটি লোকাচার। মোটামুটিভাবে বিয়ের আনুসঙ্গিকতা ও বিয়ের অনুষ্ঠানের সমাপ্তির ভেতর দিয়েও এই স্তরের ইতি ঘটেছে। বিয়ের পরই নবদম্পতির নতুন জীবন শুরু হয়। তাই এর পরের স্তরে দেখা যায় সাজু-রূপাই এর বিবাহিত জীবনের খুঁটি-নাটি বিভিন্ন ঘটনা।

তৃতীয় স্তর ঃ সাজু-রূপাই এর নতুন সংসার গড়ে ওঠে স্বাভাবিক পরিবেশে। কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল এই কৃষক দম্পতি। রূপার বৃদ্ধ মা হঠাৎই মৃত্যুবরণ করার পর মায়ের মৃত্যুতে কিছু দিন তারা শোকে বিহ্বল হয়ে পড়লেও পরবর্তীতে এই শোক কাটিয়ে উঠে আবার সংসারে মনোনিবেশ করে–

নতুন চাষা ও নতুন চাষাণী পাতিল নতুন ঘর,
বাবুই পাখিরা নীড় বাঁধে যথা তালের গাছের পর।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৪৮]

আশ্বিন শেষে কার্তিক মাসে ধান কাটার মৌসুম তাই কৃষক-কৃষাণীর কারো একটু ফুসরৎ মেলে না। তবুও তাদের বুক ভরা আনন্দ। কারণ সারা বছর তারা এই ফসলের উপর ভরসা করে থাকে। তাদের জীবিকা যার উপর নির্ভর সেই মাঠের ধান পাকা দেখে আনন্দে কৃষকের হৃদয় দুলে উঠে। কৃষকের হৃদয়ের একান্ত অনুভূতি এভাবে কবি তুলে ধরেছেন–

আশ্বিন গেল, কার্তিক মাসে পাকিল খেতের ধান,
সারা মাঠ ভরি গাইছে কে যেন হলদি কোটার গান।
ধানে ধান-লাগি বাজিছে বাজনা, গন্ধ উড়িছে বায়,
কলমীলতায় দোলন লেগেছে, হেসে কূল নাহি পায়।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৪৮]

পথে প্রান্তরে পাকা ধানের ছড়াছড়ি-

সারা মাঠে ধান, পথে ঘাটে ধান উঠানেতে ছড়াছড়ি,
সারা গাঁও ভরি চলেছে কে কবি ধানের কাব্য পড়ি।

শুধু কৃষকের কেন কৃষাণীর হৃদয়ও আনন্দে আত্মহারা-

কৃষাণীর গায়ে গহনা পরায় নতুন ধানের কুটো;
এত কাজ তবু হাসি ধরে নাক, মুখে ফুল ফুটো ফুটো।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৪৯]

এই স্তরেই আবার নতুন কিষাণ-কিষাণীর মান অভিমানের পর্বটিও সুন্দরভাবে বর্ণনার পাশাপাশি রূপাই-সাজুর জীবনের ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত দিয়েছেন কবি। যেমন–

ক্রমে রাত বাড়ে, বউ বসে দূরে, দুটি চোখ ঘুমে ভার,
"পায়ে পড়ি ওগো চলো শুতে যাই, ভাল লাগে নাক আর।"
রূপা ত সে কথা শোনেইনি যেন, বাঁশী বাজে সুরে সুরে,
'ঘরে দেখে যারে সেই যেন আজি ফেরে ওই দূরে দূরে।'

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৫১]

তাই রূপা এক অজানা আশঙ্কায় ভীত হয়ে বধূকে বলে-

বাহুখানা তার কাঁধ পরে রাখি রূপা কয় মৃদু সুরে,
"শোন শোন সই, কে যেন তোমায় নিয়ে যেতে চায় দূরে!"

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৫৩]

নানা আশঙ্কায় রূপাই-এর হৃদয় ভীত। তাই আকস্মিকভাবে বন গেঁয়োরা ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে–এমন সংবাদ রহিম মামার কাছ থেকে পেয়ে সে ছুটে চলে গাজনার চরে। আর এর সঙ্গে সঙ্গে রূপাই জড়িয়ে পড়ে চরের জমি নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামায়। শুরু হয় দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ। এই দাঙ্গার ফলেই রূপাই ফেরারী হয় এবং নেমে আসে তাদের সুখী জীবনে করুণ ট্র্যাজেডি। রূপাই-এর জীবনে এই পরিণতির পেছনে তার নিজের কর্মফলই দায়ি। কারণ প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে সে অনেকের মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত করে মৃত্যু পথে পাঠিয়েছে যার ফলে তাকে বেছে নিতে হয় ফেরারী জীবন। রূপাই পুলিশের ভয়ে রাতের আঁধারে অল্প কিছু সময়ের জন্য প্রিয়তম স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাড়ি দেয় অজানার উদ্দেশ্যে। এরই সঙ্গে শুরু হয় তাদের ট্র্যাজিক জীবন। জসীম উদ্‌দীন প্রতিটি ঘটনা ধাপে ধাপে সযতনে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

চতুর্থ স্তর:-

চতুর্থ স্তরে সম্পূর্ণ অংশে রয়েছে সাজুর বিরহিত জীবন। কবি কাহিনী নির্মাণে ও কাহিনীর সাবলীলতা আনয়নে কৌশলী ছিলেন বলে রূপাই-এর মা-র মৃত্যু ঘটিয়ে ফেরারী অবস্থায় সাজুর করুণ পরিণতিকে আরো রসঘন করে তুলেছেন। রূপাই পরিত্যক্ত একাকিনী সাজুর বাড়িতে অবস্থান সম্ভাব নয় বলে আশ্রয় নেয় বৃদ্ধা মায়ের কাছে। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাহিনী কাব্যটির এ স্তরের বিশেষ দিকটি হল রূপাই যে ঝগড়ায় জড়িয়ে অনেক লোকের মাথা ফাটিয়েছে তার জন্য সে অনুশোচনায় দগ্ধ। রূপাই সাজুকে বিধাতার হাতে সমর্পণ করে ফেরারী হয়। বিচ্ছেদের আগে রূপাই ভালবাসায় ভরপুর কিছু কথা সাজুকে বলে। তাদের বিচ্ছেদের দৃশ্য করুণ রসে পূর্ণ। তাই সাজু রূপাইকে পেছন থেকে ডেকে বলে–

"এই শেষ কথা! সাজু কহে কেঁদে, বলিবে না আর কিছু?"
খানিক চলিয়া থামিল রূপাই, কহিল চাহিয়া পিছু,
রূপাই বলে–"মোর কথা যদি মনে পড়ে সখি, যদি কোন ব্যথা লাগে,
দুটি কালো চোখ সাজাইয়া নিও কাল কাজলের রাগে।
সিন্দুরখানি পরিও ললাটে মোরে যদি পড়ে মনে,
রাঙা শাড়ীখানি পরিয়া সজনি চাহিও আরশী কোণে।"

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ৬৬]

উপরের এই চরণগুলি রূপাই-সাজুর বিচ্ছেদের দৃশ্য পাঠককে বেদনাতুর করে তোলে। রূপার বিরহে সাজুর জীবনে নেমে আসে বিরহের মর্ম যন্ত্রণা। স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম তার জীবনকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। রূপাই এর ফেরারী হওয়ার এক বছর অতিক্রান্ত হলেও তার কোন সংবাদ না পেয়ে তার জন্য প্রতি মুহূর্তে সাজুর অন্তরে যে দহন সৃষ্টি হয় তার উত্তাপ এসে লাগে বৃদ্ধ মায়ের মধ্যেও। সে

মেয়ের করুণ অবস্থা সহ্য করতে না পেরে পথে পথে জন খাটতে আসা দিন-মজুরদের আদর-যত্ন করে পান-তামাক খাওয়ায় শুধু রূপাই-এর কোন সংবাদের আশায়। বৃদ্ধার একমাত্র অবলম্বন মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। তার এই শোকাচ্ছন্ন অবস্থা কাব্যটিকে সার্থক ট্র্যাজেডির পথে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়। মেয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে সে বলে–

কানের কাছেতে মুখ লয়ে মাতা ডাক ছাড়ি কেঁদে কয়,
"সাজু সাজু! তুই মোরে ছেড়ে যাবি এই তোর মনে লয়?"
"আল্লা রসুল! আল্লা রসুল!" বুড়ী বলে হাত তুলে,
"দীন দুঃখীর শেষ কান্না এ আজিকে যেয়ো না ভুলে!"
দুই হাতে বুড়ী জড়াইতে যায় আঁধার রাতের কালি,
উতলা বাতাস ধীরে বয়ে যায়, সব খালি! সব খালি!!
"সোনার সাজুরে, মুখ তুলে চাও, বলে যাও আজ মোরে,
তোমারে ছাড়িয়া কি করে যে দিন কাটিবে একেলা ঘরে।"

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৭৬]

স্বামী বিরহে মায়ের সামনে মেয়ের প্রাণ ত্যাগ 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যটিকে ট্র্যাজেডিতে পরিণত করে। প্রথমে যে বেদনা রূপাই ও সাজুর হৃদয়ে ছিল পরে তা সাজুর বৃদ্ধ মাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। বৃদ্ধ মায়ের একমাত্র অবলম্বন মেয়ে তাকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছে। বৃদ্ধার হৃদয় হাহাকার করে ওঠে–

দুখিনী মায়ের কান্নায় আজি খোদার আরশ কাঁপে,
রাতের আঁধার জড়াজড়ি করে উতল হাওয়ার দাপে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৭৬]

মৃত্যুর আগে সাজু নক্সী-কাঁথা বোনা শুরু করেছিল। রূপাই ফেরার হওয়া পর্যন্ত যতদিন বেঁচে ছিল তা শুধু এই কাঁথা অবলম্বন করে। এই কাঁথায় সে তার জীবনের ইতিহাস মনের মতো করে এঁকেছে–

নক্সী কাঁথাটি বিছাইয়া সাজু সারারাত আঁকে ছবি,
ও যেন তাহার গোপন ব্যথার বিরহিয়া এক কবি।
অনেক সুখের দুঃখের স্মৃতি ওরি বুকে আছে লেখা,
তার জীবনের ইতিহাসখানি কহিছে রেখায় রেখা।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৭২]

তার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ছিল যে, একদিন তার প্রিয়তম স্বামী ফিরে আসবে আর এই জন্য সাজুর ইচ্ছা তার আঁকা নক্সী কাঁথা যেন তার কবরের ওপর বিছিয়ে দেয়া হয়। কারণ, তার স্বামীর চোখের জল কবরে পড়লে তার ঘুম ভাঙার কষ্ট সে সহ্য করতে পারবে না। এখানে সাজুর মনের করুণ অবস্থা 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কে ট্র্যাজিক দোলায় দোলায়িত করেছে–

"সে যদি গো আর ফিরে আসে কভু, তার নয়নের জল,
জানি জানি মোর কবরের মাটি ভিজাইবে অবিরল।
হয়তো আমার কবরের ঘুম ভেঙে যাবে মাগো তাতে,
হয়ত তাহারে কাঁদাইতে আমি জাগিব অনেক রাতে।
এ ব্যথা সে মাগো কেমনে সহিবে, বোলো তারে ভাল করে,
তার আঁখি জল ফেলে যেন এই নক্সী কাঁথার পরে।"

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৭৫]

জীবন থেকে পালিয়ে গিয়েও রূপাই নিস্তার পায়নি। অবশেষে রোগ জর্জর দেহে স্ত্রীর কবরের পাশে সে নিজেও জীবনের ইতি টেনেছে। কাব্যের সমাপ্তি ঘটেছে সাজু-রূপাই এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। রূপাই এর মৃত্যু আরো বেদনাঘন হয়ে ওঠে যখন তার হাতে স্ত্রীর জন্য থাকে কখানা রঙিন শাড়ি। সাজু তার জীবনের শুরু থেকে দাম্পত্য জীবনের নানা স্মৃতি নক্সী কাঁথায় তুলে ধরে তার কবরে মেলে রেখেছে। স্ত্রীর জন্য শেষ শাড়ি এনে রূপাই তার ভালবাসার একনিষ্ঠতা প্রমাণ করে। জসীম উদ্‌দীন-এর 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' একটি সার্থক ট্র্যাজেডি।

সোজন বাদিয়ার ঘাট

'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনের যে বৈশিষ্ট্য তা 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে কিছুটা ভিন্ন। দুটি কাব্যেই পল্লীর কিশোর-কিশোরীর প্রেম প্রাধান্য পেলেও এর উপস্থাপনা ভিন্ন। এখানে ভিন্ন সম্প্রদায়ের কিশোর-কিশোরীর প্রেম ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা একটি জটিল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যও কয়েকটি স্তরে ভাগ করা যায়।

প্রথম স্তর ঃ

এখানে আছে সোজন-দুলীর কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ ও তাদের অনুরাগসিক্ত প্রেম এবং সমাজের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মিলনের প্রচেষ্টা। এই স্তরে প্রথমেই হিন্দু-মুসলমানের অসম্প্রদায়িক মনোভাবের একটি সুন্দর চিত্র আছে। কবি সোজন-দুলীর প্রেমের উন্মেষ ও বিকাশ এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও দেহ বর্ণনার সঙ্গে সোজন-দুলীর পরিবারের অবস্থা দেখিয়েছেন। সোজন ও দুলী দুই সম্প্রদায়ের তরুণ-তরুণী হলেও তারা সাম্প্রদায়িক চিন্তার উর্ধ্বে। ছোটবেলার খেলার সাথী থেকে যৌবনে এসে প্রণয় প্রণয়ীতে পরিণত হয়। এই স্তরেই সোজন দুলীর স্পর্ধিত যৌবনের আবেগ ধরা পড়ে দুলীর মায়ের কাছে। আবার মহররমের সামান্য লাঠি খেলাকে কেন্দ্র করে বেঁধে যায় সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব। মোটামুটিভাবে সোজন-দুলীর কৈশোরের প্রেম, দুই গ্রামের বন্ধুসুলভ মানসিকতা ও মহররমের লাঠি খেলার মাধ্যমে যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বাধে তার বিস্তৃত বর্ণনা এই স্তরে প্রাধান্য পেয়েছে। এই দাঙ্গায় হিন্দু সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ হয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তির শরণাপন্ন হলে তার ইঙ্গিতের মাধ্যমে এই স্তরের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় স্তর ঃ

দুই গ্রামের দ্বন্দ্বের কারণে সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত হয়। বিক্ষুব্ধ নমুরা মহররমের লাঠি খেলায় অপমানিত হয়ে তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য রাম নগরের নায়েব মশাই এর নিকট যায়। এখানে থেকে শুরু হয় দুই গ্রামের ভেতরের দ্বন্দ্ব। এতদিন নমু-মুসলমান সুখে-দুঃখে মিলেমিশে ছিল কিন্তু সমাজে প্রভাবশালী ব্যক্তি এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন ভাঙতে চাইলো নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। সুযোগও তাদের কাছে এসে যায়। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা গ্রামীণ সহজ-সরল মানুষের যে কত সর্বনাশ হয়েছে তা বর্ণনাতীত। জসীম উদ্‌দীন অত্যন্ত সাবলীলতার সঙ্গে ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। প্রথম স্তরে যেমন সোজন-দুলীর বাল্য প্রণয়ের পরিণত রূপ এবং গ্রামের খুঁটি-নাটি বর্ণনা এবং গ্রামে মহররমের লাঠি খেলায় যে সাম্প্রদায়িক বীজ বপন করা হয় তার তান্ডব লীলা দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। আবার কুচক্রী নায়েব মশাই-এর পরামর্শে প্রথমে নমু সম্প্রদায়ের প্রধান গদাই নমু, মুসলমানদের গ্রাম থেকে বিতাড়িত করার বিষয়ে মনস্থির করলেও বিবেকের তাড়নায় রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব থেকে রেহাই পায় কিন্তু হিন্দুদের আক্রমণের প্রস্তুতি টের পেয়ে মুসলমানরাও শিমুলতলী গ্রাম ছেড়ে আশ্রয় নেয় কাজির গ্রামে। এই দাঙার অবশ্যম্ভাবিতা এবং তা থেকে বিবেক জাগ্রত হবার দিকটি কবি উপস্থাপন করেছেন বাস্তব রূপে।

তৃতীয় স্তর ঃ

এই অংশে সোজন-দুলীর পালিয়ে যাওয়া জীবনের কাহিনী অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানেরা শিমুলতলী গ্রাম থেকে রাতের আঁধারে পালিয়ে যায়। এই ঘটনা শিমুলতলী গ্রামের সহজ-সরল হিন্দু সম্প্রাদায়ের নর-নারীকে ব্যথিত করে। তবুও বাস্তবতাকে স্বীকার করে শুরু হয় নতুন জীবনের। সবাই সব কিছু ভুলে গেলেও সোজন ও দুলী কেউ

কাউকে ক্ষণিকের তরে ভুলে যেতে পারে না। দুই গ্রামের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হওয়ার পর তারা সব কিছুকে অতিক্রম করে গোপনে দেখা করে ও বিয়ের আসরে দুলী সোজনের হাত ধরে অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। তারা গহীন বনের মধ্যে আশ্রয় নেয় যেখানে সাম্প্রদায়িকতার করাল গ্রাস তাদের ছোবল মারতে পারবে না। সেখানে তারা কিছু দিন নিশ্চিন্তে থাকলেও পরে সোজন ব্যাপারীর নায়ে কাজে গেলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। প্রথম স্তর থেকে তৃতীয় স্তরের কাহিনী এক সুরে বাঁধা। জসীম উদ্‌দীন এই ভিন্ন সম্প্রদায়ের তরুণ-তরুণীর প্রেমকে মানবিক দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাই যখন গড়াই নদীর তীরে তারা ছোট কুটির রচনা করে তখন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য সমানভাবে ধরা দিয়েছে তাঁর কাব্যে। দুজন পালিয়ে বনের মধ্যে মনোরম সংসার গড়ে তোলে। নদীর তীরে ছোট কুটির, সেখানে লাল নটে শাক, মটরের ডাল, মসুরের ডাল, লঙ্কা-মরিচ সব মিলিয়ে প্রকৃতির এক নিটোল ছবির সঙ্গে তাদের ছোট খাট মান অভিমান ও ভালবাসা। কবি এসব দিকের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন। তাদের ভালবাসার দৃশ্য–

"যাও-ছাড়-লাগে," এবার বুঝিনু বউ তবে কথা কয়,
আমি ভেবেছিনু সব বউ বুঝি পাখির মতন হয়।
হয়ত এমনি পাখির মতন এ-ডাল ও-ডাল করি,
'বউ -কথা-কও' ডাকিয়া ডাকিয়া জনম যাইবে হরি।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৯৮]

সোজন দুলীকে ভাল অবস্থায় রাখার জন্য অধিক টাকা পাবার আশায় ব্যাপারীর নায়ে কাজ নেয়, এতে দুলীর মত ছিল না। সে জানত যে পুলিশ তাদের পিছু পিছু আছেই কিন্তু সোজন পুলিশের কথা চিন্তা না করে পাটের নায়ে যোগ দেয়। সোজন ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। এই স্তরের কাহিনীর এখানেই সমাপ্ত।

চতুর্থ স্তর ঃ

এই স্তরে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত। শিমুলতলী গ্রামে মহররমের লাঠি খেলাকে কেন্দ্র করে যে ভয়ঙ্কর দাঙ্গার সূচনা তা শেষ পর্যন্ত না ঘটলেও হিন্দু মেয়ে মুসলমানের ছেলে নিয়ে পালিয়েছে এই বিষয়টি আর নমুরা সহ্য করতে না পারায় তারা ক্ষিপ্র গতিতে প্রতিশোধ নিতে কাজীর চক আক্রমণ করে। এখানে উল্লেখ্য কুচক্রী নায়েবের হিংস্র থাবা সব সময় তাদের পিছনেই ছিল। এবার তা কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে নমুদের নির্দেশ দিল–

"গ্রাম জ্বালাইবি-বন পোড়াইবি-মুন্ডু কাটিবি–
যারে যেথা পাবি খুঁজে,
তারপর আছে সদর কাছারী, থানার দারোগা,
আমি নিব সব বুঝে!
ডিগ্রী করিয়া ডিগ্রী জারীতে ভিটামাটি ঘর
লইব নিলাম করি,
হাহাকার করে কাঁদিয়া ফিরিবে পথে পথে তারা,
বলিনু শপথ করি।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৮৩]

ধর্মীয় দিক থেকে এ দ্বন্দ্বের পরিণাম ছিল ভয়ঙ্কর। নমু মুসলমান নায়েবের ফাঁদে পা দিয়ে নিজেদের সর্বনাশে লিপ্ত হয়। নমু-মুসলমান যার যার মতো নামিদামি লেঠেল ভাড়া করে। নমুদের সৃহৃদ নায়েব যেমন উস্কে দেয় নমুদের, তেমনি ঢাকার নবাবও মুসলমানদের উস্কে দিলেন। যেমন–

নায়েব মশায় ছিলেন সদয় যতেক নমুর তরে,

তেলিহাটির পরগণাতে এলেন দাওয়াৎ করে।
মোহনপুর, কেষ্টপুর, মাধবদিয়া ছাড়ি,
পঙ্গপালের মতন নমু ছুটল তাড়াতাড়ি!
ঢাকার নবাব, দিলেন জবাব, হাজার মুসলমান,
পদ্মা নদী পার হইয়া ঘিরিল আসমান।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ১১১, ১১২]

দেখা যাচ্ছে দুপক্ষকে উস্কিয়ে দেওয়ার জন্য দুই সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ভূমিকা বেশ জোরাল। এই সহজ-সরল মানুষগুলির মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিষ ঢুকিয়ে দেওয়ার পর তারা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়াল মারে–

এমনি করে দিনের পরে যতই দিবস চলে,
নমু-মুসলমান মাতিল রণের কোলাহলে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ১১২]

গ্রাম, ঘর-দোর পুড়ে ছারখার, কিন্তু কারো কোন হুঁশ নেই। অবশেষে যখন এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বন্ধ হল তখন আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। জীবিতদের মধ্যে থাকে শুধু বুক ভরা ক্রন্দন আর হতাশা-

জনম-দুখী, পেড়ারমুখী রইল বেঁচে যারা,
তাদের বুকের কবরে ঘাস মেলল নাক চারা।
বাতাস লেগে চিতা থেকে উড়ল শুধু ছাই,
বুকের চিতার দ্বিগুণ আগুন জ্বালিয়ে দিল তাই।

[সোজন বাদীয়ার ঘাট, পৃঃ ১১৩]

মূর্খ তারা তাই তাদের মধ্যে যারা এই সংঘর্ষ বাধিয়ে দিল তাদের কোন দুঃখ নেই বরং নায়েবের শিমুলতলীতে জমিদারের হাট বসানোর দীর্ঘ দিনের ইচ্ছা পূরণ হয়। এতদিন তিনি এ কাজে সম্মান পাননি হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির কারণে। এখন আর কোন বাধা থাকে না–

নায়েব মশায় বড়ই সদয়, মূর্খ নমুর তরে,
হুকুমে তাঁর হাট বসিল শিমুলতলীর পরে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১১৩]

কবি বাস্তবরূপে কুচক্রী জমিদার শ্রেণীর লোক দ্বারা কিভাবে সাম্প্রদায়িক কলহ সৃষ্টি হয় তারই ছবি তুলে ধরেছেন এই স্তরে। পাপ করলে শাস্তি পেতে হবে তাই নায়েবও এর ব্যতিক্রম নয়। শিমুলতলীর অত্যাচারী আত্মা এরপর নায়েবের উপর নিয়েছিল চরম প্রতিশোধ। হঠাৎ-ই একদিন গদাই নমু ও ছমির লেঠেলের দেখা হয়ে গেলে তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে ও যার জন্য আজ তাদের এ অবস্থা তার বিরুদ্ধে তারা নেয় চরম প্রতিশোধ। একদিন নায়েব মশাই এর খোঁজ পাওয়া যায় না এবং-

পরের দিনে সকাল বেলা দেখল পথিক জন,
এপার বিলের কবর বাঁধা ওপার চিতা কোন!

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১২০]

জসীম উদ্‌দীন অত্যন্ত দক্ষ হাতে প্রতিটি স্তরের কাহিনী বিন্যাস করেছেন যা ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে। কাহিনীর ধারা সুবিন্যস্ত। নক্সী-কাঁথার মাঠ'-এ যেমন সহজ-সরল সামাজিক জীবনের নিটেল প্রেমের ছবি এঁকেছেন সেখানেও গ্রামীণ ঝগড়ায় রূপাই ফেরার হয়ে যাওয়ার কারণে সাজুর জীবনে নেমে আসে ট্র্যাজেডি। স্বভাবতই এটি নক্সী-কাঁথার মাঠের মতো সরল রৈখিক গতিতে চলতে পারেনি। কাহিনীর ক্ষেত্রে ভিন্নতা এসেছে ধর্মীয় দ্বন্দ্বের কারণে এবং তা এ রচনায় জটিলতা সৃষ্টি করেছে। 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যেরও সমাপ্তি ট্র্যাজেডিতে। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যে যেমন রূপাই-এর অপেক্ষায় থেকে বিরহিণী সাজু মৃত্যু বরণ করে আর এই মৃত্যুকে সহ্য করতে না পেরে ফেরারী রূপাই বহুদিন পরে স্ত্রীর জন্য রঙিন শাড়ি হাতে তারই কবরের পাশে মৃত্যু বরণ করে। সাজু-রূপাই দুজনের ভেতর কোন মানসিক দ্বন্দ্ব ছিল না। তারা কাব্যের প্রথম থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছে কিন্তু এখানেই 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যের প্রধান চরিত্রের সঙ্গে 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যের নায়ক-নায়িকার পার্থক্য।

পঞ্চম স্তর ঃ

জসীম উদ্‌দীন এই কাব্যের শেষ স্তরে চিত্রিত করেছেন সোজন-দুলীর ট্র্যাজেডি। সোজনের সাত বছর জেল হয় নারীহরণ মামলায়, আর নায়েব মশাই এর চেষ্টায় দুলীর বিয়ে হয় অন্যত্র। সোজন সাত বছর জেল খেটে বেদের বহরে যোগ দেয় দুলীকে খুঁজে বের করার বাসনায়। সোজনের হাহাকার-

যাহার তরেতে বাদিয়ার ঝালী বয়ে ফিরি দেশে দেশে,
আজো সে আমারে নারে দেখা দিল, কথা না কহিল এসে।
উড়িয়া যাওরে পঙ্খি অনেক দূরেতে যাও,
অভাগিনী দুলী কোন দেশে থাকে দেখিতে কি তারে পাও?

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ১২৬]

সোজন জীবনের শেষ প্রান্তে এসে গেছে, তাইতো তার ভয়-

'উঞ্চল ডালে থাকরে পঙ্খি-নজর বহুত দূর,
হয়ত বা তুমি জান সন্ধান মোর প্রাণ বন্ধুর।'
যদি জান তবে এনে দাও তারে দেরীর সময় নাই,
মাটির প্রদীপ করে নিবু নিবু, বড় ভয় লাগে তাই।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ১২৬]

সোজন যেমন দুলীর সন্ধানে বেদের নায়ে দেশে দেশে তাকে খুঁজেছে, তেমনি দুলী অন্যের গৃহিণী হয়ে তার চেয়ে শতগুণ আগুনে পুড়ছে। বড় ঘরে বিয়ে, স্বামীর সোহাগ সত্বেও বাল্য প্রণয়ী সোজনকে কিছুতেই সে ভুলতে পারে না। দুলীর ভেতর এক অপরাধবোধ ক্রিয়াশীল হয়। সে হয়তবা কোন পাখির বাচ্চাকে তার মার কাছ থেকে নিয়ে এসেছিল। যার ফলে আজ তার জীবনে নেমে এসেছে এই অভিশাপ। এখানে দেখা যায় নক্সী-কাঁথার নায়িকা সাজুরও এমন একটি মনোভাবের কথা জানা যায় যখন রূপাই ফেরারী হয়ে দিনের পর দিন নিরুদ্দেশ থেকেছে, তখন সাজুর মনে হয়েছে সে হয়তবা কোন জেলের মাছ দাম না দিয়ে খেয়েছে, যার অভিশাপে আজ তার সোনার সংসার ভেঙে ছারখার হয়ে গেছে। সাজুর মতো দুলীও বিধাতাকে দোষারোপ করেছে। দুলী মনে মনে ভাবে সব স্মৃতি ভুলে যাবে কিন্তু স্মৃতি ভুলে যাওয়া যায় না, তার স্মৃতিপট শুধুই সোজনময়। অন্যের ঘরে থেকে নিজের বাল্য প্রণয়া সোজনকে প্রতিনিয়ত মনে পড়ায় সে বুঝতে পারে এটা উচিত নয়, কারণ সে অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী। সে নিজেকে এভাবে তিরস্কার করেছে–

আর সে সোজন–ভগবান–ভগবান–
মাথায় দুলীর ভাঙিয়া পড়ুক-

খর বাজভরা সুদূরের আসমান।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ১৩১]

দুলীর একটি চরম মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে হঠাৎ বেদে বেশে এসে সোজন তার জীবনকে এলোমেলো করে দিল। দুলী তাকে স্বামীর বংশ মর্যাদার কথা বলে প্রত্যাখ্যান করলে সোজন চরম মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগে। তার কেবলই মনে হতে থাকে সারাটা জীবন যেন সে একটা মিথ্যার পেছনে ঘুরেছে। তার কেবলই মনে হয়–

কেন বা তোমারে খুঁজিয়া পাইনু,
এ জীবনে যদি ব্যথার নাহিক শেষ–
পথ কেন মোর ফুরাইয়া গেল
নাহি পৌঁছিতে মরণের কালো দেশ।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ১৪৫]

সোজনের অন্তরে যে কষ্ট তা যেন চিৎকার করে প্রতিধ্বনিত হয়েছে আকাশে বাতাসে। সে দুলীকে মিনতি করে তাকে ফেলে না যাওয়ার জন্য কিন্তু দুলী চলে গেলে–

ধরায় লুটায়ে কাঁদিল সোজন,
কেউ ফিরিল না, মুছাতে তাহার দুখ;
কোন্ সে সুধার সায়রে নাহিয়া
জুড়াবে সে তার অনল-পোড়া এ বুক?

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ১৪৭]

সোজন দুলীর দুয়ার হতে টলতে টলতে বালুর চরে এসে বিষলক্ষের বড়ি খেয়ে আত্মহত্যার পথে অগ্রসর হয় এবং বাঁশিতে করুণ সুরে তুলে নিজের ব্যর্থ প্রেমের আর্তি প্রকাশ করে। সোজনকে দুলী ফিরিয়ে দিয়ে এক মুহূর্তের জন্য শান্তি পায় না। এক সময় ঘুমন্ত স্বামীর কাছে ক্ষমা চেয়ে সোজনের বাঁশির সুর অনুসরণ করে নদীর তীরে পৌঁছে ঘোষণা করে–

তোমরা পুরুষ কি করে বুঝিবে একেরে পরাণ দিয়া,
নারীর জীবন কি করে বা কাটে আরেরে বক্ষে নিয়া।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৫৭]

এক মুহূর্তের জন্যেও দুলী সোজনকে ভুলতে পারেনি। গুমরে মরেছে নিভৃতে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় দুলীর মুখের উক্তিতে-

এক দুলী যার জীবনের প্রতি নিঃশ্বাসটুকু হায়,
চির বিরহিয়া সোজনেরে তার স্মরিতেছে নিরালায়।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৫৮]

দুলীর ভেতর বাহির সর্বত্রই ছিল সোজন। তাই তার অকপট ঘোষণা-

"আজো দুলী তার সোজনেরে ছাড়া কাহারেও নাহি জানে,
সোজন তাহার ঘরে ও বাহিরে দেহে মনে আর প্রাণে।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৫৮]

কিন্তু তখন সোজন বিষলক্ষের বড়ি খেয়ে মৃত্যুর দ্বারে উপনীত। দুলী তাকে অনুসরণ করে। সোজন-দুলীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এ ট্রাজেডির সমাপ্তি ঘটে।

সকিনা

জসীম উদ্‌দীনের তৃতীয় কাহিনীকাব্য তাঁর অন্য দুটি কাহিনী কাব্য 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' থেকে ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যদ্বয়ে যেমন পল্লীর কিশোর-কিশোরীর নির্মল প্রেম দেখিয়েছেন 'সকিনা' কাব্যে তার কিছু ব্যতিক্রম ঘটেছে। 'সকিনা' কাব্যে প্রেম প্রাধান্য পেলেও এই প্রেমের মধ্যে দেখা যায় নানা জটিলতা। এখানে কবি নর-নারীর মনোবিশ্লেষণে অনেক বেশি মনোযোগী। 'সকিনা' কাব্য রচনাতেও লক্ষ করলে দেখা যাবে এর কাহিনী গ্রন্থনের ক্ষেত্রে কয়েকটি স্তর রয়েছে। এখানে মোটামুটি চারটি স্তর বিদ্যমান, যার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে কাহিনীর জট খুলেছে।

প্রথম স্তর ঃ

গরীব ঘরের মেয়ে সকিনার বাবা টাকা পয়সার বিনিময়ে তাকে বিয়ে দেয় এক দাগী চোরের সাথে। যেমন–

খসম তাহার দাগ-কাটা-চোর, রাতে রহিত না ঘরে,
হেথায় হোথায় ঘুরিয়া ফিরিত সিঁদ কাটি হাতে করে।
সারাটি দিবস পড়িয়া ঘুমাত, সকিনার সনে তার,
দেখা যে হইত ক্ষণেকের তরে, মাসে দুই একবার।

[সকিনা, পৃঃ ১]

স্বামী তাকে কল্পিত কোন অপরাধে মারধর করত। প্রতিনিয়ত স্বামীর অত্যাচার ও লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পাবার আশায় সে স্বামীকে ত্যাগ করে আরো বিভিন্ন লোকের হাতে পড়ে–

এমন স্বামীর বন্ধন ছাড়ি বহু হাত ঘুরি ফিরি,
দুঃখের জাল মেলে সে চলিল জীবনের নদী ঘিরি।

[সকিনা, পৃঃ ২]

'নক্সী-কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে প্রেম যেমন স্বপ্নে বিভোর, আপনাতে আপনি বিকশিত কিন্তু 'সকিনা' কাব্যে প্রেম বাস্তবের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। দাগী চোর স্বামীর ঘর থেকে নিস্তারের জন্য সকিনা তাকে ছেড়ে এসে আরো বড় বিপদে পড়েছে। একজন ভাগ্য বিড়ম্বিতা নারীর জীবনের করুণ কাহিনীই যেন 'সকিনা' কাব্যে পরিস্ফুট। কলুষিত জীবন ছেড়ে নির্মল জীবনের পথে সে অগ্রসর হতে চেয়েছে বারবার। তার জীবনে প্রভাত সূর্যের মতো প্রেমের আলোবর্তিকা নিয়ে দেখা দেয় তরুণ জমিদার আদিল। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লান্ত সকিনা'র কাছে আদিলের প্রেম প্রার্থনা স্বপ্নের মতো মনে হয়। দ্বিতীয় স্তরে আদিল সকিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। সমাজের লম্পটদের হাতে লাঞ্ছিত সকিনা একটু সুখের আশায় আদিলের সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে।

দ্বিতীয় স্তর ঃ

আদিলের মনের ভেতর সাত রং-এর খেলা করে। বিয়েতে প্রথমে সকিনা অমত করে কারণ যে দেহ-মন তার স্বর্গীয় হতে পারত তা এখন অপবিত্র, তাই সে বিয়ে করতে চায়নি। কিন্তু আদিলের অনুরোধে ও প্রেমাবেগে শেষ পর্যন্ত সে রাজি হয়। সকিনার উক্তি–

"সাক্ষী থাকিও আল্লা রসুল! আপন অনিচ্ছায়,
সব চেয়ে যেবা পবিত্র মম তারে দিনু আমি হায়;
এই দেহ মন যাহা জনে জনে কালি যে মাখায়ে গেছে,
তাই নিল আজি মোর ফেরেস্তা আপনার হাতে যেচে।"

[সকিনা, পৃঃ ৭]

সেও মনে প্রাণে আদিলকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সকিনার নতুন স্বামী গৃহেও শান্তি মেলেনা। সকিনার প্রতি রূপজ মোহ কেটে গেলে আদিলের মনে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। কেবলই তার মনে হতে থাকে যে নারী বিভিন্ন হাত বদল হয়েছে সে কি করে তার সন্তানের জননী হবে। আদিলের অন্তরে ধ্বনিত হয়–

ছবির উপরে ছবি ভেসে আসে, ভূবন মোহিনী পরী,
দেহের পাত্রে আনিয়াছে কোন মোহের মদিরা ভরি।
এই দেহ লয়ে লালসার খেলা খেলিয়াছে জনে জনে,
তারা যেন আজ ভিড় করে এসে উপহাসে তার সনে।

[সকিনা, পৃঃ ১০]

আদিল অর্ন্তদ্বন্দ্বে জর্জরিত-

এই কথা যেন আকাশ বাতাস সকল কাটিয়া ধায়,
এই কথা যেন বিষের মতন নাড়িতে নাড়িতে বায়।
এই সে কুলটা রমণী তাহার ছেলের জননী হবে,
তার ভবিষ্য বংশের সনে এ কাহিনী বেঁচে রবে।

[সকিনা, পৃঃ ১২]

আদিলের অর্ন্তদ্বন্দ্ব তার হৃদয়ে সন্দেহের দানা বাঁধে। অবশেষে আদিল মনস্থির করে সকিনাকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে কিন্তু সকিনা গর্ভবতী জেনে গৃহ থেকে বিদায় করে দেয়। এর পরবর্তী স্তরে তিনু ফকিরের কাছে সকিনা আশ্রয় পায়।

তৃতীয় স্তর ঃ

তিনু ফকির সারিন্দার সুরে গান গেয়ে ভিক্ষা করে। সে সকিনার জীবনের দুঃখের ঘটনা শুনে তা সারিন্দার সুরে বাজিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে গান গেয়ে মানুষের মন জয় করে। সকিনার কোলে পুত্র সন্তান আসে। তিনু ফকিরের অবর্তমানে একবার বন্যায় তার ছোট কুটীর ভেসে যায়। জসীম উদ্‌দীন অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাহিনী বয়ন করেছেন যার ফলে প্রতিটি অধ্যায়ের সাথে রয়েছে অন্তর্মিল। পর্যায়ক্রমে কাব্যের কাহিনী গ্রন্থনে সুদক্ষ নির্মাতার পরিচয়ক পাওয়া যায়। তিনু ফকিরের কাছে সকিনা মেয়ের সম্মানে ভালই ছিল কিন্তু হঠাৎ বন্যার আক্রমণে তার শেষ আশ্রয়টুকুও ভেসে যায়, শুরু হয় তার অনিশ্চিত জীবন। নিজের জন্য যতটা নয় তার চিন্তা ছেলে তোতার জন্য।

জসীম উদ্‌দীনের চারটি কাহিনী কাব্যে ট্র্যাজিক পরিণতি লক্ষ করা যায়। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে নায়ক-নায়িকার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ট্রাজেডি হলেও সকিনা কাব্য খানিকটা স্বতন্ত্র। এই কাব্যের নায়ক-নায়িকা দুজনই জীবিত থাকা সত্ত্বেও এই কাব্য ট্রাজেডিতে পরিণত হয়। 'সকিনা' কাব্যের শেষ স্তরে জসীম উদ্‌দীন কুশলী শিল্পীর মত আদিল ও সকিনা জীবনের ট্রাজেডি দেখিয়েছেন।

চতুর্থ স্তর ঃ

জমিদার দুর্ভাগা সকিনাকে ঘর থেকে বিতাড়িত করার পর সকিনা রাস্তায় আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রেমিক স্বামী আদিলের গৃহে বেশি দিন সে সুখে থাকতে পারেনি। তার এই অসহায় অবস্থায় তিনু ফকিরের গৃহে আশ্রয় পেলেও তার অন্তরের ভেতরে আগুন জ্বলে সারাক্ষণ। তিনু ফকির তার কষ্ট জানতে চাইলে তার উত্তর–

"আমার মতন জনম দুখী বাপজানগো তৃজগতে নাই,
দুষ্কের পসরা লয়া আমি ভাসিয়া বেড়াই।
ছায়া নিবার গেলাম আমি বট বিরিক্ষির পাশে,
সেও বৃক্ষের ঝরিল পাতা আমার দীরঘ শ্বাসে।"

[সকিনা, পৃঃ ২৫]

তার হৃদয়ের হাহাকার আরো গভীর হয় সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর। তার চাপা কষ্ট সন্তানের পিতা থাকা সত্ত্বেও পিতার আদর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত। তার মলিন মুখের কারণ তিনু ফকির জানতে চাইলে সে বলে–

"নারীর শোভা সিন্তার সিঁন্দুর তারো কিবা দাম,
যে নারীর ভাগ্যে তার পতি হইল বাম!
আমি নারী অভাগিনী শত দোষ হায়,
কোলের ছেলে তোতামণি না দেখল পিতায়।"

[সকিনা, পৃঃ ৫০]

'সকিনা' কাব্যে আদিলের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে স্ত্রীর সতীত্ব নিয়ে। সকিনাকে বিতাড়িত করার পর-ই আদিলের মধ্যে শুরু হয় অপরাধবোধ। মিথ্যা সমাজনীতির বেড়াজালের পড়ে আদিল সকিনাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তাই তার হৃদয় অনুশোচনার আগুনে দগ্ধ–

শুধু সে ভেবেছে সমাজের খ্যাতি, বংশের সম্মান,
যারা সে অবলা বালিকারে পেয়ে হানিয়াছে বীষবান।
যে সমাজ বিধি সকিনার মত শত শত বালিকারে,
নানা ঘটনার ঘূর্ণীতে ফেলি মেরেছে হাজার মারে;
সে সমাজ বিধি যুগে যুগে রচি নিরপরাধীর ফাঁস,
দুর্ব্বলে মারি আনিয়াছে সদা সবলের মুখে হাস,
তারি মোহে পড়ি সকিনারে সে যে তাড়ায়ে দিয়েছে হায়,
সোনার প্রতিমা ভাসায়ে দিয়েছে নামহীন দরিয়ায়!

[সকিনা, পৃ: ৪০]

আদিলের মানসিক অবস্থা চরম হয়ে উঠলে তার নিজ গৃহে টেকা দায় হয়। সে ঘর বাড়ি ত্যাগ করে এক কাপড়ে রাস্তায় নামে সকিনার খোঁজে–

সোনার ঘর সোনার বাড়ি শূন্য পইড়া রইল,
এক বস্ত্র হইয়া আদিল পন্থে মেলা দিল।
না খায় দানা না খায় পানি এদেশ ওদেশ ধায়,
বৃক্ষ দেখলে তারি ছায়ায় রজনী কাটায়।
নীহারের পানিতে ভাসে দীঘল রজনী,
আজ্খীর জলে শীতল না হয় বুকের পোড়নি।

[সকিনা, পৃ: ৪৩]

সকিনাহারা হয়ে আদিল পাগলপ্রায়। তিনু ফকির সারিন্দার তারে সকিনার কাহিনী বর্ণনার পর গাজীর গানের আসর বসে। আদিল সেই আসরে সকিনার কাহিনী অভিনয় করে দেখায় ও লোকপ্রিয়তা পায়। আদিল জানতে পারে তিনু ফকির এই

আসরে ছয় মাস পর আবার আসবে। সে অপেক্ষা করতে থাকে। সকিনা বিরহে আদিল জর্জরিত। সকলের প্রতি আদিলের একান্ত অনুরোধ–

"শোন গো নগরিয়া লোকজন কহি ধইরা পায়,
পরাণের সকিনারে তোমরা আইনা দাও আমায়।"

[সকিনা, পৃঃ ৬১]

আদিলের হৃদয়ের আর্তনাদ কবি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন–

সকিনার নাম লিখি আদিল জমীনের গায়,
আঙ্খীর জলেতে তারে জিয়াইতে চায়।
আঙ্খীর জলেতে সে নাম মুইছা মুইছা যায়,
আবার লিখিয়া নাম কান্দিয়া ভিজায়!
খনে কান্দে খনে হাসে পাগলের পারা,
সকিনা সকিনা করি বক্ষে বহে ধারা।

[সকিনা, পৃঃ ৬২]

সকিনা বিরহে মুহ্যমান আদিল আকস্মিকভাবে তিনু ফকিরের সঙ্গে সকিনার ও তার ছেলে তোতার দেখা পায়। পিতা পুত্রের এক অপরূপ মিলন দৃশ্য–

বাপজান বলিয়া পুত্র পায়ে সালাম দিল,
এক ফোঁটা চক্ষের পানি বাপের গায়েতে পড়িল।

[সকিনা, পৃঃ ৬৩]

আদিল আবেগে আপ্লুত হয়ে নিজ সন্তানকে কোলে তুলে নিল-

নয়ন মেলিয়া আদিল পুত্র কোলে নিল,
চান্দ মুখে আদরিয়া কতই চুমা দিল।
হাতখানি শুখে পুত্রের বুকখানি শুখে,
অন্তর ভরিয়া যায় কি অসহ সুখে।

[সকিনা, পৃঃ ৬৩]

আদিল স্ত্রী পুত্রকে তার সঙ্গে করে নিতে চাইলে সকিনা রাজি হয়নি। কারণ সে জানে মিথ্যা সমাজ সংস্কারের বেড়াজাল তার পিছু ছাড়বে না। জীবনের বাস্তব দিক চিন্তা করে সকিনা নিজের একমাত্র অবলম্বন ছেলে তোতাকে স্বামী আদিলের হাতে তুলে দিয়েছে। আদিলের মধ্যে দ্বিধা ও সংস্কার নতুন করে জন্ম নিতে পারে বলে স্বামীর সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেনি। সে সংসারের লোভ যেভাবে সংবরণ করেছিল তাতে তার চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়। আদিলের চাইতে তার জীবনে ট্র্যাজেডির মাত্রা বেশি। আদিল স্ত্রী সকিনাকে হারিয়েছে কিন্তু সন্তান পেয়েছে আর সকিনা স্বামী সন্তান দুজনই হারিয়েছে। কাব্যের শেষ স্তবকগুলিতে সকিনার রিক্ত হৃদয়ের আর্তনাদ –

বাপের সঙ্গে চলিয়াছে ছেলে, ফিরে চায় বারে বারে,
পারিত সে যদি দুটি চোখ ভরি টেনে নিয়ে যেত মারে।
পাথরের মত দাঁড়ায়ে সকিনা, স্তব্ধ যে মহাকাল,
খুঁজিয়া না পায় অভাগিনী তরে সান্ত্বনা ভাষাজাল।
চরণ হইতে চলার চক্র খসিয়া খসিয়া পড়ে,
নয়ন হইতে অশ্রুর ধারা নিশির শিশির ঝরে।

[সকিনা, পৃঃ ৭৩]

সকিনা স্বামী সন্তান পুনরায় ফিরে পেলেও স্বইচ্ছায় এক অনিশ্চিত জীবন বেছে নিয়েছে যার কারণে তার জীবনে নেমে এসেছে চরম ট্র্যাজেডি। জসীম উদ্‌দীন তৃতীয় কাহিনী কাব্য সকিনাতে প্রতিটি স্তর বিন্যাস করেছেন দক্ষ হাতে। যৌবনপ্রাপ্ত রূপসী সকিনার প্রথম জীবনে দাগী চোরের সাথে বিয়ে হয়ে বিভিন্ন হাত বদল ঘটে অবশেষে দয়াবান তরুণ জমিদার আদিল তাকে এই পঙ্কিল জীবন থেকে এনে সুন্দর জীবনের হাতছানি দিয়েছিল কিন্তু তাও টেকেনি আদিলের মানসিক বিক্রিয়ার কারণে। তার সাময়িক সুখের সংসার ভেঙে যায়। শুরু হয় তার বেদনাময় জীবন যা কাব্যের শেষ পর্যন্ত প্রবাহিত।

মা যে জননী কান্দে

'মা যে জননী কান্দে' জসীম উদ্‌দীনের সর্বশেষ কাহিনী কাব্য। প্রেমের স্বরূপ উন্মোচন তিনটি কাহিনী কাব্যে লক্ষ করা গেলেও 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে প্রেম নানা সংঘর্ষে জর্জরিত। এই কাব্যে তিনি স্বপ্ন বিভোর একজন কবি নন এখানে তিনি বাস্তববাদী এক কবি। এখানে তাঁর ঔপন্যাসিক মনোভাবের পরিচয় মেলে। 'নক্সী-কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' ও 'সকিনা' কাব্যে তিনি যেমন পল্লীর ভাব ও বিষয়বস্তু নির্ভর করে কাহিনী রচনা করেছেন এদিক থেকে তাঁর 'মা যে জননী কান্দে' সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। কারণ প্রথম থেকেই এখানে নগর জীবনের ভাব অনুসৃত। যার ফলে কাব্যের নর-নারীদের মধ্যে পল্লীর সহজ-সরল মানুষের যে বৈশিষ্ট্য তা অনুপস্থিত। এখানে প্রেম ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত নয়। এখানে একজন নারীর জীবনের উত্থান-পতন ও তার ট্রাজিক পরিণতিই স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই কাব্যের নর-নারীরা তাদের অধিকার আদায়ে অনেক বেশি সচেতন। তারা জটিল সমাজ সত্যের মধ্যে পড়ায় তাদের মানসিক পরিবর্তনও ঘটেছে। শহরে বসবাসরত কুট্টির মেয়ে আমিনার বিদ্রোহী প্রেমিক সত্তা চূড়ান্ত দুর্গতির মধ্যে পড়ে কিভাবে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে তা জসীম উদ্‌দীন দরদ দিয়ে এঁকেছেন। এই কাব্য মধ্যে কতগুলি স্তর পরিলক্ষিত।

প্রথম স্তর ঃ

কুট্টির মেয়ে আমিনা তার গরীব বাপ-মার ঘরে জন্ম গ্রহণ করে পেয়েছে শুধু একরাশ রূপ যৌবন। যার দরুন প্রতিক্ষণ পাড়াপ্রতিবেশী তার বাপ-মাকে নানাভাবে বিরক্ত করতে শুরু করে। আমিনা নিজেও বুঝতে পারে তার সারা অঙ্গে কে যেন বাঁশি বাজায়–

দেখিল সহসা আকাশে বাতাসে বাজিছে রূপের স্তব,
সেথায় চলেছে তারে লয়ে বুঝি কানাকানি করে সব।
কোথা সে লুকাবে, হাতের গহনা খুলে সে ফেলিল হায়,
তবু দুটি হাতে টুনটুনি করে শত চুড়ি মুরছায়!

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ১১]

সে এই নব যৌবনকে কোথায় লুকিয়ে রাখবে ভেবে পায় না। অবশেষে তার বাপ-মা সিলেটের আশি বছরের জমিদার রহিম মিঞার সাথে আমিনার বিয়ে দেয়–

আমিনার বাপ কি আর কহে আশার অতীত বর,
ভাবতে তাহার প্রাণের পুলক নাচে নানানতর।
গরীব পিতা, মণি-মানিক সোনার ঝলক দেখে,
চোখ যে তাহার ঝলসে গেল বুদ্ধি গেল বেঁকে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ১৫]

বৃদ্ধ জমিদারের টাকা পয়সার অভাব না থাকলেও সে অপারগ ছিল সন্তান জন্মদানে। আমিনার এত ধন-দৌলত ভাল লাগে না, সে ভেতর ভেতর গুমরে মরে। তার মনের সব আনন্দ কে যেন কেড়ে নিয়েছে। তার হৃদয়ের হাহাকার–

জ্বরায় জীর্ণ স্খলিত লুলিত এই বৃদ্ধের পাশে,
তাহার জীবন হাহাকার ভরা উপহাস সম হাসে।
এই শৃঙ্খল, এই ব্যর্থতা, ছোট তার ভীরু হিয়া,
তবু কোন এক দুরাশা তুফান ওঠে সদা আলোড়িয়া!

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ২১]

সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় তার এই শৃঙ্খলিত জীবনকে মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। সে স্বপ্ন দেখে ছোট সংসার যেখানে সে তার মাতৃত্বের সাধ পূরণ করতে পারবে। তাই সে প্রতিনিয়ত ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মিথ্যা সংসার যেখানে ধন-দৌলত দিয়ে ভরিয়ে রাখে তা থেকে সে নিজেকে মুক্ত করে এবং তার ঘোষণা–

কিসের ব্যাসাত, কিসের বিত্তি, মণি-মানিকের জাঁক,
এই মিথ্যার দেশেতে ইহারা পিছনে পড়িয়া থাক।

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ২৪]

তার নারী জন্ম সার্থক করার জন্য জমিদার স্বামীর ড্রাইভারের ইশারায় সে সাড়া দিয়ে তার হাত ধরে কোলকাতা শহরের উদ্দেশ্যে পালিয়ে যায়। এখানে কবি অতি বাস্তবতার সঙ্গে আমিনার অন্তঃকরণের আর্তনাদ শুনিয়েছেন। জসীম উদ্‌দীন মানব-দরদী কবি তাই সমাজের বিরোধী কাজ আমিনা করলেও তিনি তার সেই দিক বড় করে দেখেননি। তিনি আমিনার জননী হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকেই বড় করে দেখেছেন বলে আমিনার জননী সত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। প্রথম স্তরে আমিনার বৃদ্ধের সাথে বিয়ে ও তার স্পর্ধিত যৌবন কিভাবে সমাজ সংসার সব ফেলে তরুণ ড্রাইভারের প্রেমে সাড়া দিয়েছে তাই বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় স্তরে বর্ণিত হয়েছে ড্রাইভারের সাথে তার পলায়ন ও অস্থায়ী সংসার জীবন।

দ্বিতীয় স্তর ঃ

আমিনা তার স্বামীর ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে কোলকাতা শহরে বস্তির মধ্যে ছোট কুটিরে বসবাস করে। এই বস্তির এক বাস্তব চিত্র জসীম উদ্‌দীন দিয়েছেন। যেখানে সর্বদা অভাব, দারিদ্র লেগেই থাকে। কিন্তু এই আমিনার স্বর্গ। ছোট খোলার ঘরে ড্রাইভার পতি দিয়ে তার সুখের সংসার। তার ভেতরে সর্বদা পুলক জাগে।

সারাদিনভর ঘরের সব কাজ শেষে সে তার স্বপ্নের জাল বোনে ছোট ছোট কাপড়ে। তার দেহের ভেতরেও চলে বিধাতার সূক্ষ্ম সৃষ্টি তা সে বুঝতে পারে। তাই ছোট ছোট অনেক জিনিস সংগ্রহ করে। কিন্তু আমিনা সন্তান সম্ভবা জেনে তার তরুণ প্রেমিক আনন্দিত না হয়ে বরং সমাজের ভয়ে জমিদার রহিম মিঞা পুলিশ লাগিয়েছে এই ভয়ে আমিনাকে সন্তান নষ্ট করতে বলে। সে মাঝরাতে খুনির বেশে এসে আমিনাকে ঔষধের গুঁড়ো দিয়ে নির্দেশ দেয় সন্তান হত্যার। যে সন্তানের কামনায় সে জমিদারের ঘর ছেড়ে একবস্ত্রে ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছে তাকেই পৃথিবীর আলো দেখার আগে মেরে ফেলবে তা আমিনা গ্রহণ করতে পারেনি। এদিকে অসহায় আমিনাকে ফেলে প্রেমিক ড্রাইভার প্রথম সুযোগেই পলায়ন করে। শুরু হয় আমিনার ট্রাজিক জীবন। অনেকদিন অপেক্ষা করেও ড্রাইভার পতির কোন সন্ধান মেলে না। সে অভাব দারিদ্র্যে ক্ষত-বিক্ষত, তার কোলে যে সন্তান আসছে তাকেও সে বাঁচাতে পারবে না। তাই সন্তানকে সে বরণ করে নিয়ে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তার জননী সত্তাকে সার্থক করে। বেঁচে থাকার জন্য নিশ্চিত আশ্রয়ের জন্য সে তার পিতা-মাতার কাছে যায়। এই দ্বিতীয় স্তরে জসীম উদ্‌দীন এক প্রতিবাদী নারী চরিত্র আমিনার ভেতরে ফুটিয়ে তুলেছেন। যে সন্তানের জন্য সমাজ সংসারের গ্লানি সে বরণ করে নিয়েছে তাকে সে পৃথিবীতে আনবেই এমন দৃঢ় সংকল্পে বদ্ধপরিকর তার হৃদয়। বহু আশা নিয়ে সে তার বাপ-মার বাড়িতে গিয়ে ওঠে। কিন্তু সেখানেও সে আশ্রয় পায় না। দীর্ঘ পথের ক্লান্তি নিয়ে আমিনা নিজ বাড়িতে এসে মায়ের স্নেহে এক মুঠ ভাত মুখে দিতে না দিতেই পিতা সব ঘটনা শুনে মেয়েকে কুলটা বলে গালি দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। গৃহ থেকে পালানোর পর রহিম মিঞা আমিনার বাড়ীতে মৃত্যু সংবাদ পাঠিয়েছিল। আমিনার বাপও সমাজ নীতির ভয়ে মেয়েকে আশ্রয় দেয়নি। ভাগ্য বিড়ম্বিত নারী তার জননী হবার জন্য জমিদার গৃহ থেকে পালিয়ে প্রতি পদে পদে

দুঃখকে বরণ করে নিয়েছে। তার প্রেম বার বার আঘাত পেয়েছে তবুও সে হাল ছাড়েনি। সব কিছুকে তুচ্ছ করে সে তার মাতৃত্বকেই জয়ী ঘোষণা করেছে। তাই দেখা যায় বিরোধী সমাজ শক্তির বিরুদ্ধে তার বিদ্রোহী জীবন। এর পরের স্তরে দেখা যায় বিদ্রোহী আমিনার জননী সত্তার বিকাশ। 'মা যে জননী কান্দে কাব্যে'র সর্বশেষ পর্বে দেখা যায় আমিনার সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর তার জীবনের করুণ পরিণতি যা কাব্যে একটি ট্রাজিক অনুভূতি সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয় স্তর ঃ

বিদ্রোহী আমিনা, জননী আমিনা। বাবা-মা-এর কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় পায় এক কৃষক-কৃষাণীর গৃহে। এখানেই তার সন্তান জন্ম নেয়। কৃষকের গৃহে সে আনন্দেই ছিল কিন্তু হঠাৎই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে সকলের সঙ্গে খাদ্যের সন্ধানে ঢাকা শহরে আশ্রয় নেয়। পথিমধ্যে কৃষক-কৃষাণী ক্ষুধার জ্বালায় মারা যায়। ঢাকা শহরে এসে কোন লাভ হয় না। সারাদিনের প্রাপ্তি একটু ফেন দিয়ে ছেলের ক্ষুধার জ্বালা মেটে না। দুর্ভিক্ষের থাবা থেকে সন্তানকে বাঁচতে মরিয়া আমিনা পথে পথে ঘুরতে থাকে কিন্তু কোথাও অন্নের সংস্থান হয় না। এমন অবস্থা চলতে থাকলে তার সঙ্গে তার সন্তানও বাঁচবে না। তাই উপায়ান্তর না দেখে এক মিশনারী সাহেবের হাতে সন্তানকে সকল স্বত্ব ত্যাগ করে তুলে দেয়। সে সন্তানের কামনায় জীবনে নানা গ্লানি, অপমান সহ্য করেছে, অন্নাভাবে সেই সন্তান আজ অপরের হাতে তুলে দিতে হচ্ছে শুধু বাঁচিয়ে রাখার প্রত্যাশায়। যে সন্তানকে কোনদিন আর দেখতে পাবে না। সে তার কণ্ঠে মা ডাক শুনবে না। এতদিনের শেষ অবলম্বন দুঃখের সাথী সন্তানের বেঁচে থাকার জন্য দুর্ভিক্ষের কাছে পরাজিত হয় এই জননী। এই কষ্ট সহ্য করার মতো অবস্থা আমিনার ছিল না তাই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে উম্মাদিনী হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছে–

উম্মাদিনী কে কাঁদিয়া ফিরিছে নগরের পথে পথে,
নিজে মহাকাল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায় চক্র-রথে।
কখনো কাঁদিছে কখনো হাসিছে ছিঁড়িছে মাথার কেশ,
কখনো শুনিছে কান পেতে যেন কোন সে গানের রেশ।
কখনো উঠিছে চিৎকার করি, এনে দেরে তোরা আজ,
এনে দে আমার সোনার যাদুরে মায়ের কোলের মাঝ।

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ৫৯]

আমিনার এই উন্মাদিনী অবস্থা দেখে কারো আর মনে থাকে না তার অসামাজিক জীবন-যাপনের কথা। কবি এখানে আমিনার করুণ অবস্থার জন্য সমাজ বিরোধী প্রেমকে দায়ি করলেও কাব্যের ভেতর আমিনার হৃদয়ের আর্তচিৎকার তার জীবনের করুণ পরিণতি তাকে ট্রাজেডিতে পর্যবসিত করেছে। জসীম উদ্‌দীনের প্রতিটি কাহিনীকাব্য গ্রন্থনে সচেতন শিল্পী মানসের পরিচয় বিধৃত। তাঁর প্রতিটি কাব্যের কাহিনী বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ট্র্যাজিক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে। কবির কাহিনী গ্রন্থন, চরিত্র সৃষ্টি ও কাব্যিক পরিণতিতে বুদ্ধি দীপ্ত মনের পরিচয় লক্ষ করা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়
জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য

জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য

কাব্য রচনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু ছাড়াও এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য বা রূপশৈলী। একজন কবির সার্থকতা তার কাব্যের বস্তুগত দিকের সাথে এর রূপ শৈলী নির্মাণে দক্ষতা। কাহিনীকাব্যে তিনি যে রূপ নির্মাণ করেছেন তা বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। রূপ শৈলী বা রূপ রস বা রূপ জগত নির্মাণ করতে হলে প্রয়োজন কাব্য মধ্যে প্রকরণগত দিকগুলো সুশৃঙ্খলভাবে ব্যবহার। এই প্রকরণগত দিকগুলো হলো কবিভাষা, ছন্দ, অলংকার, চিত্রকল্প, আঙ্গিক ও বাগভঙ্গী ইত্যাদি। জসীম উদ্‌দীন এই সার্থকতা লাভ করেছিলেন তাঁর স্বাভাবিক শৈল্পিকভাব কাব্য দেহ সৃষ্টিতে।

জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যগুলোর বিষয়বস্তু উপাদান পল্লীকেন্দ্রিক প্রতিবেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিক্ষিত রুচিবোধের পরিমিত জ্ঞান। যার ফলে কাব্য আঙ্গিক ও বাণীভঙ্গিমা পেয়েছে সার্থক শিল্পরূপ।

জসীম উদ্‌দীনের প্রায় কাব্যই সবুজ শ্যামল পল্লী প্রকৃতি নির্ভর হয়ে গড়ে উঠেছে। গ্রামের সহজ-সরল মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-দারিদ্র্য সবই তাঁর কাব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুশৃঙ্খল ছন্দ বিন্যাস ও সুবিন্যস্ত কাব্যাঙ্গিকের মিশালে তাঁর কাব্য শৈল্পিকরূপ পেয়েছে। জসীম উদ্‌দীন আধুনিক কবি জনোচিত শিল্পবোধের প্রকাশে ছন্দের অপূর্ণতা অনেকটাই দূর করতে পেরেছেন। "তাঁর রচনায় সুরের যথেচ্ছ ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে অথচ ভাবের হৃদস্পন্দনটি ঠিকমতই অনুভূত হয়।"

[সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ১৩৮৯, পৃ: ১৯৪]

জসীম উদ্‌দীন পল্লী কবিদের কাছ থেকে যে ঋণ গ্রহণ করেছিলেন তাকে একমাত্র অবলম্বন না করে তাঁর কাব্য মধ্যে অসংখ্য আঞ্চলিক ভাষার শব্দ, তৎসম, তদ্ভব ও ব্যবহৃত-অব্যবহৃত গ্রাম্য-শব্দ, হিন্দু মুসলমান ঐতিহ্য নির্ভর শব্দ প্রযুক্ত করে নতুনত্ব আনয়ন করেছেন।

"তাঁর কাব্যের বাকভঙ্গী কোথাও নাগরিক মৌখিক বা কথ্য ভাষার অনুগ, কোথাও বা কাব্যবস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী গ্রাম্য ভাষাভঙ্গীর নিকট আত্মীয়। ফলে তাঁর কাব্য অনেক ক্ষেত্রে যথার্থই যেন ভাষার 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' হয়ে উঠেছে। নানা রঙের সুতোয় বোনা নক্সী-কাঁথার মত করে তিনি নানা প্রকৃতি শব্দের সমন্বয়ে তাঁর এই ভাষার 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' রচনা করেছেন।"

[সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৩, পৃঃ ১৯৪]

পল্লী জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকা বিষয় তাঁর কাব্য মধ্যে যেন সুরের ঝংকার তুলেছে। তাঁর ভাষা সুশৃঙ্খল বাণী বিন্যাস সুগঠিত "তা পল্লী পথের বেনামী ফুলের মতোই স্বতঃস্ফুট। ঘনিষ্ঠভাবে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে জসীম উদ্‌দীনের কবি ভাষার এই বৈশিষ্ট্যের মূলে একজন সচেতন শিল্পীর সজাগতাই কাজ করেছে। সুদক্ষ চিত্রীর তুলি ব্যবহারে সাবলীলতা যেমন তার গভীর অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার পরিণাম এক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে।"

[আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী, আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, ২০০১, পৃঃ ৩০২]

আধুনিকতার জয়-জয়কারে যখন সাহিত্য জগৎ তোলপাড়, তখন এই শিল্পী দক্ষ হাতে গ্রামীণ জীবনের নিখুঁত ছবি তুলে আঁনলেন বলিষ্ঠ শব্দ শৈলী দ্বারা। তাঁর ভাব, ভাষা, সহজ ও সরল গতিতে ধাবমান। তাঁর কাহিনী নির্মাণ নির্মল সরস গ্রামের

কৃষক-কৃষাণী শ্রেণীর লোকদের নিয়ে যার ফলে তাঁর কাব্য ভাষাও তেমনি সতেজ। তাঁর কাব্যের বাক্‌ভঙ্গীও ছিল অপূর্ব সুষমামণ্ডিত যার ফলে তা আধুনিক পাঠককে আন্দোলিত করে। জসীম উদ্‌দীন কাব্যদেহ গঠনে কুশলী শিল্পীর পরিচয় দিয়েছেন। আলোচিত কাহিনী কাব্যের আঙ্গিকের মধ্যে উপন্যাসের গঠন-প্রকৃতি অনেকাংশে বিদ্যমান, যা থেকে জসীম উদ্‌দীনকেও একজন ঔপন্যাসিক বলে ধরে নেয়া যায়। তাঁর কাহিনী কাব্যগুলির প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য নির্মাণে তিনি অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর কাব্যে যে মানসম্মত রুচির পরিচয় মেলে তার মধ্যে অশিক্ষিত পল্লী কবির বৈশিষ্ট্য নেই। "মূলত জসীম উদ্‌দীন পল্লী থেকে কাব্যের মালমশল্লা সংগ্রহ করলেও তাঁর ভাষা পল্লীকেন্দ্রীক নয়, তিনি সুকৌশলে ও যথাযথ দক্ষতায় পল্লীভাষাকে মার্জিত, রুচিশীল ও গ্রহণযোগ্য করে কাব্যের গাঁথুনি দিয়েছেন। তাই তাঁর এ গাথুঁনিতে এসেছে শিল্পরূপ, প্রয়োগ কৌশলের আশ্চর্য বর্ণচ্ছটা।"

[তিতাস চৌধুরী, ১৯৮৬, পৃঃ ৬৭]

'জসীম উদ্‌দীন মূলত স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বেশি সাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। এছাড়া গ্রাম্য গীতি ছন্দ মুক্তক ও অক্ষর বৃত্তের অল্প কিছু ব্যবহার তাঁর কাব্যে দেখা যায়। স্বরবৃত্ত ছন্দ নির্ভর তাঁর কবিতাগুলোতে যে কথ্য ও ক্রিয়া পদ ব্যবহৃত হয়েছে, তার রূপ নাগরিক। মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত কবিতায় সাধু ক্রিয়া পদের প্রাচুর্য ঘটলেও, তারও সামগ্রিক আবেদনে সাধু ভাষার জড়তা নেই, কারণ সেখানেও শব্দ ভান্ডার মূলত তদ্ভব ও দেশী। তাই কথ্য ভাষার নাগরিক আমেজটি সেখানেও অনুপস্থিত নয়।'

[সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৩, পৃঃ ১৯৬]

জসীম উদ্‌দীন ভাষার আঞ্চলিকতাকে স্বাগত জানিয়ে তাঁর চারটি কাহিনী কাব্য 'নক্সী-কাঁথার মাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'সকিনা' ও 'মা যে জননী কান্দে'-তে

অতি পারদর্শিতার সাথে গ্রাম্য শব্দ ও আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার করেছেন। যার ফলে ভাষার কথ্যভঙ্গীটি পল্লী স্টাইলে হলেও এর ভেতর নাগরিকতা পরিস্ফুট। যেমন–

(১)

কানা মেঘা, টলমল বারো মেঘার ভাই,
আর ফুটিক ডলক দিলে চিনার ভাত খাই!

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-২০]

(২)

"দশ খান্দা জমি রূপার তিনটি গরু হালে,
ধানের বেড়ী ধেকে তাহার বড় ঘরের চালে।
সাজু তোমার মেয়ে যেমন, রূপাও ছেলে তেমন,
সাত গেরামের ঘটক আমি জোড় দেখিনি এমন।"

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৪০]

(৩)

তাগ্ ধুমাধুম বাদ্যি বাজে কাল শিয়ালের বিয়ে,
শিয়াল চলে শ্বশুর বাড়ি খালুই মাথায় দিয়ে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা: ৪]

(৪)

ধানের আগায় ধানের ছড়া, তাহার পরে টিয়া,
নমুর মেয়ের গায়ের ঝলক সেই না রঙ নিয়া।
দূর্বাবনে রাখ্লে তারে দূর্বাতে যায় মিশে,
মেঘের খাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা: ১]

(৫)

নতুন চাষা ও নতুন চাষাণী পাতিল নতুন ঘর
বাবুই পাখিরা নীড় বাঁধে যথা তালের গাছের পর।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৪৮]

(৬)

পাঁচটি মেয়ের মাঝের মেয়ে লাজে যে যায় মরি,
বদনা হতে ছলাৎ ছলাৎ জল যেতে চায় পড়ি।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-২০]

(৭)

চাঁদের মতন মুখখানি নয়, তবু মনে হয় চাঁদ,
একাদশী রাতে আকাশে সে ওঠে তারেই করিয়া সাধ।

[মা যে জননী কান্দ, পৃষ্ঠা-৯]

(৮)

সোনা রূপার গয়না তাহার পরিয়ে দিলে গায়,
বাড়ত না রূপ, অপমানই করতে হত তায়।
ছিপ্‌ছিপে তার পাতলা গঠন, হাত-চোখ-মুখ-কান,
হেলছে দুলছে মেলছে গায়ে গয়না শতখান।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা-২]

(৯)

ওরে ধাড়ী মেয়ে! সাপে বাঘে কেন খায় না ধরিয়া তোরে,
এতকাল আমি ডাইনী পুষেছি আপন জঠরে ধরে!

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা-২৪]

(১০)

ডিঙ্গার তলে পদ্মার পানি দাপায়ে দাপায়ে ধায়,
সুদূরের চরে রাতের উল্কা আগুন জ্বালায়ে যায়।

[সকিনা-পৃষ্ঠা-১৮]

(১১)

আঁচলের সোনা খসে যাবে পথে আগে যদি জানিতাম,
হায় হায় সখি, নারিনু বলিতে কি যে তবে করিতাম!"

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৬৩]

দেশী-বিদেশী, তৎসম ও অর্ধ তৎসম শব্দ ছাড়াও তাঁর কথ্য ভাষা ও তদ্ভব শব্দে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় মেলে। উদাহরণ–

(১)

সন্ধ্যার পরে দাবায় বসিয়া রূপাই বাজায় বাঁশী,
মহাশূন্যের পথে সে ভাসায় শূন্যের সুররাশি!

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৫১]

(২)

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দাঁতের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-১৩]

(৩)

মাঠের মাঝে জলীর বিলের জোলো রঙের টিপ,
জ্বলছে যেন এ গাঁরও-গাঁর বিরহেরি দীপ!

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-১০]

(৪)

ছোঁয়া ছুঁয়ির এতই যে বাড়, পীরের পড়া জল,
নমুর পোলার পীড়ার দিনে হয়নি তা বিফল।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা-৬]

জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যগুলির মধ্যে আর এক প্রকারের ভাষার নিরীক্ষা উপলব্ধ হয় তা হলো লোককবিদের ভাষা। লোককবিদের এই মুখের ভাষা এবং লোকজ ও গ্রামীণ শব্দ ব্যবহার করেছেন তিনি দক্ষ হাতের ছোঁয়ায়। গ্রামীণ লোকজ শব্দের ও গ্রাম্য বাকভঙ্গীর কিছু উদাহরণ নিচে দেওয়া হলো–

(১)

যাহোক রূপাই বাঁশ কাটিয়া এল খালার বাড়ি,
বসতে তারে দিলেন খালা শীতল পাটি পাড়ি।
বদনা ভরা জল দিয়ে আর খড়ম দিল মেলে,
পাও দুখানি ধুয়ে রূপাই বসল বামে হেলে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-২৮]

(২)

"কার বা কন্নাগো তুমি পন্থের মাঝে শুয়ে,
আসমানের চন্দ্র যেমন পইড়া আছে ভূঁয়ে।
কোনবা সন্ধ্যার বন্নক তুমি কইরা আইছ চুরি,
কোনবা ম্যাঘের বন্নক তোমার ক্যাশ জুড়ি?"

[সকিনা-পৃষ্ঠা-২২]

(৩)

এক লহমা খায়া কন্যা আর লহমা লয়,
হেন কালে আমিনার বাপ সামনে খাড়া হয়।
সকল শুনিয়া বাপে গোস্বায় জ্বইলা ওঠে,
দুই চক্ষু হইতে যেমন অগ্নি-গোলা ছোটে।
সেই চাহনির ধাক্কায় কন্যার হাতের মাখা ভাত,
খসিয়া পড়িয়া গেল ছড়াইয়া পাত।

[মা জননী কান্দে, পৃষ্ঠা-৩৬]

গ্রাম্য বাক্‌ভঙ্গীর এমন ভাষারীতি মূলত জসীম উদ্‌দীন 'সকিনা' ও মা যে জননী কান্দে' এই দু'টি কাহিনীকাব্যে ব্যবহার করেছেন। এখানে লোক কবির ভাষায় সাধু ও চলিত ধারার সমন্বয়ে ছন্দের গতি সুষমামন্ডিত হয়ে উঠেছে। তবে এই লোক কবিতার ভাষায় ব্যাকরণ এর কোন প্রয়োগ দেখা যায় না। এই ক্ষেত্রে জসীম উদ্‌দীন লোককবির ছাঁচে ছাঁটা–

(১)

তিনু ফকির গান গায় নগরে বাজারে,
দোজখের বয়ান করে সারিন্দার তারে।
ক্ষেতে ক্ষেতে চাষীগণ ফলায় কাউন ধান,
সোনার আখরে লেখা মাঠের জাহান।
সেই ধান লুটিয়া লয় যত মহাজন,
অনাহারী চাষী সবে করে যে ক্রন্দন।

[সকিনা, পৃষ্ঠা-২৭]

(২)

মুছাইতে মুছাইতে মুখ কান্দে জারেজার,
দুই জনার দুস্কে কাঁপে আসমান আল্লার।
কান্দিয়া কাটিয়া মাতা গোছল দিয়া তায়,
অঞ্চলে মুছাইয়া গা চান্দ মুখে চায়।
থালায় বাড়িয়া অন্ন ব্যাঞ্জন দিল পাশে,
অনাহারী আমিনার বুক পাগল তারি বাসে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃষ্ঠা-৩৬]

জসীম উদ্‌দীনের কাব্যের মধ্যে উপভাষার ব্যবহারও স্পষ্ট। বিশেষ করে কাহিনীকাব্য 'মা যে জননী কান্দে' ও সকিনা কাব্যের কয়েকটা চরিত্রের মধ্যে পূর্ববঙ্গের উপভাষার উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়–

(১)

যেখান হইতে আইছাস্ তুই সেথায় চইলা যা,
আর যেন না শুনি তোর পাপ মুখের রা;
দোহাই তোর আল্লা নবীর দোহাই বাপ-মা'র,
তিলেক মাত্র বিলম্ব তুই না করিবি আর।'

[মা যে জননী কান্দে, পৃষ্ঠা-৩৮]

(২)

চলিলাম, চলিলাম মাগো ছাড়ি তোমার বুক,
ঘুইসা ঘুইসা জ্বইলা উঠবে তোমার মনের দুখ।

[মা যে জননী কান্দে, পৃষ্ঠা-৩৮]

(৩)

শোন গো নগর বাসী আজ্খী মেইলা চাও,
সপ্ত সাগর বেড়া দইনার সব তোমরা নাও।
তোমাগো খাইতে রহুক ষোড়শো পচার।
আমাগো দাও শুধু ক্ষুধায় আহার।

[সকিনা, পৃষ্ঠা-৫৮]

গ্রাম বাংলার বাস্তব রূপ রস কবি অত্যন্ত দরদ দিয়ে চিত্রিত করেছেন। তাঁর কাব্যে স্থান পায় পল্লীর চিরচেনা মেঠোপথ, ঘাট, বুনোফুল, শাপলা, রায়ের দীঘি, পাখপাখালি, কৃষকের ঘরের তৈজসপত্র ইত্যাদি। তাঁর ভাষা ব্যবহারে স্থান পেয়েছে ধনাত্মক শব্দ গঠন প্রবণতা। এই ধনাত্মক শব্দের প্রতি কবির আলাদা একটা টান আছে বোঝা যায়। এই শ্রেণীর শব্দ ধ্বনি মাধুর্যের সাথে সাথে এর প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশ আঁটসাঁট অবস্থান তৈরী করে। তিনি এই ধনাত্মক শব্দ ব্যবহারের পাশাপাশি

শব্দ দ্বৈতের ব্যবহার এবং বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে নতুনত্ব আনয়ন করেছেন। এই ব্যবহারের ফলে মাঝে মাঝে কাব্য টীমে তালে চলে আবার এক রসপূর্ণ চপল গতিতে এগিয়ে গিয়েছে। নিচে এই ধনাত্মক শব্দের কিছু উদাহরণ দেয়া হল–

(১)

পাঁচটি মেয়ের মাঝের মেয়ে লাজে যে যায় মরি,
বদনা হতে ছলাৎ ছলাৎ জল যেতে চায় পড়ি।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-২০]

(২)

কান্-কানা-কান্ ছুটল কথা গুন্-গুনা-গুণ্ তানে,
শোন্-শোনা শোন্ সবাই শোনে, কিন্তু কানে কানে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৩৭]

(৩)

চল্-চলা-চল্ চলল্ দুখাই পথ বরাবর ধরি,
তাগ্-ধিনা-ধিন্ নাচে যেন গুন্ গুন্া গান করি।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৪১]

(৪)

ঘটকালিরই টাকা যেন ঝন্-ঝনা-ঝন্ বাজে,
হন্-হনা-হন্ চলল ঘটক একেলা পথের মাঝে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৪১]

(৫)

বিয়ের কুটুম এসেছে আজ সাজুর মায়ের বাড়ি,

কাছারী ঘর গুম্-গুমা-গুম্ লোক হয়েছে ভারি।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৪৩]

(৬)

আগে আগে ছুটল রূপা-বৌ বৌ সড়কি ঘোরে,

কাল সাপের ফণার মত বাবরী মাথায় চুল যে ওড়ে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৫৮]

(৭)

ইতল বেতল ফুলের বনে ফুল ঝুর ঝুর করেরে ভাই,

ফুল ঝুর ঝুর করে;

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা-১]

(৮)

আম-কাঁঠালের পিঁড়ি-খানি ভরি সরু সরু করে

লতা ফুল আঁকা, ঘি মউ মউ করে,

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা-৫৭]

(৯)

বাক্স ভরে টাকা-পয়সা ঝন ঝন ঝন ঝরে,

মণি-মানিক সোনায় গৃহ ঝলমল মল করে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃষ্ঠা-১৪]

জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যে কিছু শব্দ দ্বৈতের ব্যবহার নমুনা–

(১)

এ-গাঁও যেন ফাঁকা ফাঁকা, হেথায় হোথায় গাছ;
গেঁয়ো চাষীর ঘরগুলি সব দাঁড়ায় তারি পাছ।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৯]

(২)

কচি কচি হাত পা সাজুর, সোনায় সোনায় খেলা,
তুলসী তলার প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-১৮]

(৩)

টলিতে টলিতে চলিল রূপাই একা গাঁও পথ ধরি,
সম্মুখ হতে জোনাকীর আলো দুই পাশে যায় সরি।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৩১]

(৪)

কৃষাণীর গায়ে গহনা পরায় নতুন ধানের কুটো;
এত কাজ তবু হাসি ধরেনাক, মুখে ফুল ফুটে ফুটো!

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৪৯]

(৫)

কোন দিন চাষী সুইয়া সুইয়া গাহে বিরহের গান,
কৃষাণের নারী ঘুমাইয়া পড়ে, ঝাড়িতে ঝাড়িতে ধান।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৪৯]

পৌনঃপুনিক শব্দের প্রয়োগে ধ্বনি মাধুর্য ঘটিয়েছেন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে-

(১)

নাচে রূপা নাচে রূপা মুখে তাহার অট্টহাসি,
বক্ষে তাহার রক্ত নাচে, চক্ষে নাচে অগ্নিরাশি।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৬০]

(২)

ডিগ্রী জারী-ডিগ্রী জারী- ঘটি-বাটি আন ছিনিয়ে।
বধূর নাকের নথ কেড়ে আন, লাথিতে তার মুখ ভাঙিয়ে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা-৩৭]

(৩)

"হুকুম চাহিস-হুকুম চাহিস" গর্জি বলে নায়েব মশায়,
হুকুম তবে আসুক নেমে কালবোশেখির ঘুর্ণি দোলায়।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা-৪০]

(৪)

শোধ নেব ভাই-শোধ নেব এর তারি প্রতীক্ষায়,
আজও আছি আগলিয়ে এই জীর্ণ জীবনটায়।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা-১১৮]

তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতদ্ভব, দেশি, গ্রাম্য ও লোকজ শব্দ ব্যবহারে জসীম উদ্‌দীন ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কাব্যের প্রয়োজনেই তিনি পরিমিতি বোধসহ এই সব শব্দ পল্লী জীবন কেন্দ্রিক কাহিনী কাব্যগুলোতে ব্যবহার করেছেন। কাব্যের অনেক স্থানে গ্রাম্য বাগভঙ্গি ও আঞ্চলিক শব্দ অন্তর্ভুক্ত। তিনি অপ্রয়োজনে কাব্যে গ্রাম্য শব্দের আধিক্য

না বাড়িয়ে বিশেষ প্রয়োজনে এর সমাবেশ ঘটান । শব্দ ব্যবহারে কবির আরও একটি দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কাব্য মধ্যে অত্যন্ত সুকৌশলে আরবী-ফার্সি শব্দের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। গ্রামবাংলার মুসলমান সমাজের নিত্যনৈমিত্তিক ভাষা ব্যবহারে যে আরবি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগ ঘটে তাও তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাই দেখা যায় মুসলমানদের ধর্মীয় কাজে ব্যবহৃত এই আরবী-ফার্সি শব্দগুলি কাব্যের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে পড়েছে। মুসলমান সমাজের ধর্মীয় রীতিনীতি ছাড়াও তিনি হিন্দু সমাজের ধর্মীয় অবস্থা তুলে ধরতে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারও করেছেন। আরবি-ফার্সি শব্দ তিনি কাব্যদেহে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে সমস্ত কাব্য মধ্যে এক চমৎকারিত্বের আভাস পাওয়া যায়। গ্রাম বাংলার লোক জীবন ও সংস্কৃতির সাথে ওতোপ্রোতভাবে মিশে আছে মুসলমান সামাজিক জীবন ও ধর্মীয় আচার। জসীম উদ্‌দীনের, কাহিনী কাব্যগুলির প্রত্যেকটির ভেতর এই আরবি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগ ধরা পড়ে। নিম্নে এর কিছু উহাহরণ দেয়া হল–

(১)

দরগা তলা দুগ্ধে ভাসে, সিন্নী আসে ভারে;
শৈলা গানের ঝঙ্কারে গাঁও কানছে বারে বারে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-১৯]

(২)

ফুল পাগড়ী মাথায় তাহার 'জোড়া জামা' গায়।
তেল-কুচ্-কুচ্ কালো রঙে ঝলক দিয়ে যায়।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৪৪]

(৩)

বসল গাঁয়ের মোল্লা মোড়ল গল্প গানে মাতি।
কেতাব পড়ার উঠল তুফান; - চম্পা কালু-গাজী।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৪৩]

(৪)

মোল্লা তখন কলমা পড়ায় সাক্ষী উকিল ডাকি,
বিয়ে রূপার হয়ে গেল, ক্ষীর ভোজনী বাকী!

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-৪৬]

(৫)

সামনে লইয়া কোরান শরীফ সুরা-ফাতেহার চরণ পড়ি,
সারে জাহানের ক্রন্দন যেন চোখ দুটি তার আসিছে ভরি।
রোজ-হাশরের পড়িছে বয়ান, নিশিথিনী যেন অলক-ভার,
আঁধারে আছাড়ি শান্ত করিতে চাহিতেছে কোন বেদনা তার।
দীনের রসুল কেয়ামত-দিনে খোদাতাল্লার আরশ ধরি,
যেমন করিয়া কাঁদি উঠিবেন নিখিল নরের ভাগ্য স্মরি;

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃষ্ঠা-৪৬]

(৬)

খোদার নিকটে পঞ্চ রেকাত নামাজ আদায় করি,
সাত বার সে যে মনে মনে নিল দরুদ সালাম পড়ি।

[সকিনা, পৃষ্ঠা-১৭]

(৭)

মায়ের কান্দনে আজ আসমান ভাইঙ্গা পড়ে।
আরশ কুরছিতে আল্লা নিজে রোদন করে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃষ্ঠা-৩৯]

(৮)

'মাগো আমার, দুখিনী মা, অভাগিনী মা,
আমার, ছুঁইয়া কসম কর মা তুই মইরা যাবি না।

[মা যে জননী কান্দে, পৃষ্ঠা-৫২]

(৯)

'হায় আল্লা বারিতালা আপে পরওয়ার,
আমি মরলে কি হইবে দুখিনীর বাচ্চার।

[মা যে জননী কান্দে, পৃষ্ঠা-৫৩]

উল্লেখিত উদাহরণগুলোতে আরবি-ফার্সি শব্দ ব্যবহারে কবির দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই শব্দগুলো বাংলা ভাষার শব্দের সাথে এক হয়ে মিশে গেছে। কাব্যের শিল্প প্রকরণের বর্ণনায় শব্দ ব্যবহার ও বাকভঙ্গী বা বাণীভঙ্গীর পরেই আসে অলংকারের প্রয়োগ। একটি কাব্যদেহের সমুন্নত প্রকাশ ঘটে অলংকারের সুষ্ঠু ব্যবহারের উপর। অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগ ছাড়া কবিতার আকার নির্মাণ সম্ভব নয়। একটি কাব্যদেহে অলংকার শুধু শোভা বর্ধনই করে না তা কাব্যের প্রাণ, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকে এর লাবণ্য। প্রাণ না থাকলে সেই কাব্য নীরস হয়ে ওঠে। আর অলংকার সমৃদ্ধ কাব্য পাঠকদের তৃপ্তি ঘটাতে সক্ষম। জসীম উদ্‌দীন কাহিনী কাব্যে অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগে কলা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। যে সব গুণের দ্বারা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা, ধ্বনির শ্রুতি মাধুর্য এবং অর্থের হৃদয় গ্রাহিতা বৃদ্ধি পায় তাই

অলংকার। অলংকার মূলত দুই প্রকারের (১) শব্দালংকার ও (২) অর্থালংকার। জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যে শব্দালংকারের ব্যবহার প্রচুর। শব্দালংকার হলো শব্দের কারুকার্যতা। জসীম উদ্‌দীন মূলত শব্দালংকার অনুপ্রাস ব্যবহার বেশি করেছেন। অনুপ্রাস অলংকারের সকল ব্যবহারই তার কাব্যে পরিস্ফুট। কিন্তু যমক, শ্লেষ, বক্রোক্তি ইত্যাদির প্রয়োগ খুব একটা চোখে পড়ে না। জসীম উদ্‌দীন কাব্যে এই শব্দালংকার কিভাবে ব্যবহার করেছেন তা উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো যায়। একটি শব্দালংকারের প্রধান যে বিষয় বা কাঠামো তা হলো এর ধ্বনি বৈচিত্র্য। কাব্যের ধ্বনি মাধুর্য ফুটে ওঠে অনুপ্রাস ও ধ্বন্যুক্তির শব্দালংকারের মাধ্যমে। "অর্থহীন বা সার্থক ধ্বনিরূপের প্রয়োগে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, তাহাকে ধ্বন্যুক্তি অলংকার বলে।"

[জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, ১৩৬৪, পৃ: ৩০৫]

"আর একই বাক্যে অদুরবর্তী বিভিন্ন শব্দে একটি বা একাধিক বর্ণের আবৃত্তি হইলে যে সৌন্দর্য প্রকাশ পায়, তাহার নাম অনুপ্রাস অলংকার"।

[সুধীর কুমার দাশ গুপ্ত, ১৯৬৩, পৃ: ২০]

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, 'ধ্বন্যুক্তি ও অনুপ্রাস উভয় অলংকারেরই উপজীব্য বর্ণধ্বনি। তবে ধ্বন্যুক্তিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় একক বা সংযুক্ত বর্ণ ধ্বনির পুনঃপুনঃ প্রয়োগে। ধ্বনির পৌনঃপুণিকতা অনুপ্রাসের অন্যতম লক্ষণ, ধ্বন্যুক্তিতে এই পৌণঃপুনিকতা নাও থাকতে পারে।'

[জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, ১৩৬৪, পৃ: ২৪২]

জসীম উদ্‌দীন অনুপ্রাস অলংকার ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নিম্নে তার এই দুই রকমের শব্দালংকারের উদাহরণ দেয়া হলো। যেমন-

১। অনুপ্রাস

(ক)

লাঙল জোয়াল ধুলায় লুটায় মরচা ধরে ফালে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃষ্ঠা-১৯]

(খ)

মুসলমানের যেথায় বসতি সেথা মসজিদ আপনি হবে,
মানুষ মরিলে মসজিদে বসে আল্লাহর নাম কাহারা লবে?

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ৪৯]

(গ)

সে কথার আমি পাব সন্ধান, দুঃখ দাহন মাঝে,
হয়ত বেদন-নাশন-কখন গোপনে সেখানে রাজ্যে।

[সকিনা, পৃ: ৭২]

(ঘ)

আকাশ হইতে, বাতাস হইতে কি যেন সোনার সুখ,
রাম ধনু রঙে উড়িয়া আসিয়া ভরিছে তাহার বুক!

[মা যে জননী কান্দে, পৃ: ২৭]

(ঙ)

জলীর বিলের জলে তারা জলের খেলায় ভাসে।

[নেশা পৃ: ১০]

(চ)

হাতে তার সেই বাঁশের বাঁশিটি বাজায় করুণ সুরে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ৮০]

ধ্বন্যুক্তি

(১)

কান্-কানা-কান্ ছুটল কথা গুন্-গুনা-গুন্-তানে
শোন্-শোনা-শোন্ সবাই শোনে, কিন্তু কানে কানে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৩৭]

(২)

বদনা হাতে ছলাৎ ছলাৎ জল খেতে চায় পড়ি।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ২০]

(৩)

ঘটকালিরই টাকা যেন ঝন্-ঝনা-ঝন্ বাজে
হন্-হনা-হন্ চলল্ ঘটক একলা-পথের মাঝে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৪১]

(৪)

চল্-চলা-চল্ চলল্ দুখাই পথ বরাবর ধরি,
তাগ্-ধিনা-ধিন্ নাচে যেন গুণ্ গুণা গান করি।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ১৪]

(৫)

পাতায় পাতায়, খস্ খস্ খস্ শুনে কান খাড়া করে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৬২]

(৬)

আগে আগে ছুটল রূপা বৌ বৌ বৌ সড়কি ঘোরে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৫৮]

(৭)

ইতল বেতল ফুলের বনে ফুল ঝুর ঝুর করেরে ভাই,
দেখে এলাম কালো মেয়ে গদাই নমুর ঘরে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১]

(৮)

তারও দূরে শোঁ শোঁ নদী, মধ্যে বালুচর,

[সকিনা, পৃঃ ৪৫]

(৯)

বাক্স ভরে টাকা-পয়সা ঝন ঝন ঝন ঝরে,
মণি-মানিক সোনায় গৃহ ঝলমল মল করে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ১৪]

জসীম উদ্‌দীন তাঁর কবি প্রতিভার গুণে এসব শব্দালংকার সার্থক ভাবে কাব্যদেহে প্রয়োগ করেছেন। এরপর জসীম উদ্‌দীনের কাহিনী কাব্যগুলোর মধ্যে আর এক চমৎকারিত্বের প্রকাশ দেখা যায়। আর তা হলে তার সজীব সরল উপমা উৎপ্রেক্ষা।

উপমা উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারে জসীম উদ্‌দীনের দক্ষ শিল্পীসত্তার পরিচয় লক্ষ করা যায়। তিনি কাব্যে উপমার যে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তার উপাদান পল্লী থেকে সংগৃহীত। পল্লীর একান্ত নিত্যদিনের অতি সাধারণ বিষয় কবির কাব্যের উপমার উপকরণ হয়েছে। তাই উপমা, উৎপ্রেক্ষার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় পল্লীর পরিবেশ, নদী, ডোবা, খোলা আকাশ, চাঁদ, মেঘ, কুয়াশা, মটরের শাক, বউটুবানী, কলমীফুল, বেতঝাড়, সীম, দুর্বা ঘাস, ডাহুক মেয়ে, লালনটে শাক, শিমুল গাছ, সুপারী গাছ,

গাভী, ডানকিনে মাছ, কাকের চোখ, জোনাকী পোকা প্রভৃতি। এ সব মিলে গ্রামবাংলার এক নিটোল ছবি উপমা, উৎপ্রেক্ষা দিয়ে তিনি সযত্নে গ্রন্থন করেছেন।

কাব্য মধ্যে অলংকার না থাকলে তা কাব্যের শোভাবর্ধন ও প্রাণ এই দুটিই বিনষ্ট করে, তাই প্রয়োজন অলংকারের প্রয়োগ। শব্দালংকার ধ্বনির সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য আনয়ন করে আর অর্থালংকার অর্থের সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্য প্রকাশ করে। অর্থালংকার প্রয়োগে কাব্যের মধ্যে ভাষার দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। অর্থালংকার মোটামুটিভাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়–

১। সাদৃশ্যমূলক অলংকার।

২। বিরোধমূলক অলংকার।

৩। গুঢ়ার্থমূলক অলংকার।

৪। শৃঙ্খলামূলক অলংকার ও

৫। সম্বন্ধমূলক অলংকার।

উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান, অতিশয়োক্তি, প্রতিবস্তুপমা, দৃষ্টান্ত, ব্যতিরেক, দীপক প্রভৃতি সাদৃশ্যমূলক অলংকারের উপবিভাগ। এই সবগুলোর মধ্যে উপমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। "উপমা যেন কবিগণের স্বাভাবিক বাকভঙ্গি, সে যেন ভাবের অলংকার নয়। তাহার যথাযথ প্রকাশ যাহা অনির্বচনীয়, তাহাকে চিত্রিত করিবার একমাত্র উপায়।"

[মোহিত লাল মজুমদার, প্রকাশকাল: ১৮৭৯, পৃ: ৪৩]

প্রত্যক্ষ কোন বস্তুর সাথে পরোক্ষ কোন বস্তুর তুলনায় প্রত্যক্ষ বস্তুটি উপমেয় আর যার সঙ্গে তুলনা বা সাদৃশ্য দেখানো হয় তা পরিচিত উপমানরূপে। উপমান ও

উপমেয়র ভেতর একটি সাধারণ ধর্ম থাকবে যা এ দুটির ভেতর সমানভাবে ক্রিয়াশীল থাকবে। যেমন–

'কাঁচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া'

এখানে কচি মুখের সাথে কাঁচা ধানের পাতার তুলনা করা হয়েছে। কাঁচা ধানের পাতা যেমন মায়াময় মুখও তেমনি মায়াময় অর্থাৎ মায়া এখানে সাধারণ ধর্ম যা কাঁচা ধানের পাতা ও কচি মুখ দুটিতে বিদ্যমান।

'জসীম উদ্‌দীনের কাহিনী কাব্যের মধ্যে এই উপমা অলংকারের বিস্তৃত প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন–

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!
কাঁচা ধানের পাতার মত কচি মুখের মায়া,
তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মত বাহু দুখান সরু,
গা খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ১৩]

"প্রথাশাসিত অঙ্গ-বর্ণনার পরিচয় জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে নেই। রূপের ব্যঞ্জনায় উপমাশ্রয়ী নিসর্গের এমন বিবৃত স্বভাব পরিচয় প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নেই। নায়কের রূপচ্ছবি কেবল নায়িকার প্রেমার্তির মধ্যে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত নয়। বাংলা কবিতায় এই সর্ব প্রথম নায়কের সৌন্দর্য আদর্শায়িত না হয়ে বাস্তব শ্রী ও লাবণ্যমন্ডিত

হলো। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্র থেকে এসেছে বলেই এসব উপমানের চমৎকারিত্ব এতো বেশি।"

[আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী, আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, প্রকাশকাল: ২০০১, পৃ: ১৪৮]

মূলত অর্থালংকারের প্রয়োগে জমীম উদ্‌দীন সিদ্ধ হস্ত। এই অলংকারের ভেতরে মূলত সাদৃশ্যমূলক অলংকার উপমা, রূপক ও সমাসোক্তির প্রয়োগে তিনি কৃতিত্বের দাবিদার। বিশেষ করে উপমা ও উৎপ্রেক্ষতা সৃষ্টি ও ব্যবহারে তাঁর অসামান্য কবি প্রতিভার দৃষ্টান্ত মেলে। অন্যান্য অলংকারের ভেতর গূঢ়ার্থমূলক স্বভাবোক্তির ব্যবহারই বেশি। জমীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যে উপমা অলংকারের ব্যবহারের নমুনা:

১। উপমা

(১)

লাল মোরগের পাখার মত ওড়ে তাহার শাড়ী,
ভোরের হাওয়া খায় যেন গো প্রভাতী মেঘ নাড়ি।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ১৬]

(২)

শুকনো চেলা কাঠের মত শুকনো মাঠের ঢেলা,
আগুন পেলেই জ্বলবে সেথায় জাহান্নামের খেলা।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ১৯]

(৩)

কাল সাপের ফণার মত বাবরী মাথার চুল যে ওড়ে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ৫৮]

(৪)

কচি কচি হাত পা সাজুর, সোনায় সোনায় খেলা,
তুলসী তলার প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ১৮]

কবি অতি যত্নের সাথে তার কাব্যের নায়িকাকে উপমা অলংকারে সজ্জিত করেছেন।

আবার, গদাই মোড়লের মেয়ে দুলীর রূপ বর্ণনে কবি তাকে নানা উপমায় ভরিয়ে দিয়েছেন–

ধানের আগায় ধানের ছড়া, তাহার পরে টিয়া,
নমুর মেয়ের গায়ের ঝলক সেই না রঙ নিয়া।
দূর্বা বনে রাখলে তারে দূর্বাতে যায় মিশে,
মেঘের খাটে শুইয়ে দিলে খুঁজে না পাই দিশে।
লাউয়ের ডগায় লাউয়ের পাতা, রৌদ্রে উনে যায়।
সেই লতারি সোহাগ যেন মাখা তারি গায়।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ১৪]

জসীম উদ্‌দীনের কাহিনী কাব্যের উপকরণগুলো গ্রাম বাংলার পল্লীর পথে প্রান্তরে ছড়ানো ছিটানো, তার উপমানের বিশাল অংশ লোক জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে অবস্থিত। এর জন্য কাব্যের উপমার জন্য উপকরণে কোন ঘাটতি দেখা যায় না। "উপমা নির্মাণে ও চিত্রকল্প রচনায় তাঁর অব্যর্থ সিদ্ধি। তাঁর উপমানের ভান্ডার বাংলার লোক সাহিত্য, লোক-জীবন, লোক-সংস্কৃতি আর বিশাল পল্লী প্রান্তরে ছড়ানো।

এ জন্যেই তাঁর কাব্য প্রকরণ আধুনিক হলেও তাতে লোকজ জীবনের খাঁটি স্বাদ ফুটে ওঠে।"

[আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী, আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, ২০০১, পৃ: ১৪৭]

আরো কিছু উপমার উদাহরণ:

(১)

নতুন চাষা ও নতুন চাষাণী পাতিল নতুন ঘর,
বাবুই পাখিরা নীড় বাঁধে যথা তালের গাছের পর।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ৪৮]

(২)

বাঘের ছেলে আজকে মোরা মেঘের মত চরছি মাঠে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ৮৯]

(৩)

সামনে দাঁড়ায়ে মনির মুন্সী, বয়স তাঁহার আশির কাছে,
ঘন সাদা দাড়ী, প্রশান্ত মুখে মমতার মত জড়ায়ে আছে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ৪৬]

(৪)

সামনে তাহার ছোট ঘরখানি ময়ূর পাখির মত,
চালায় দুখানা পাখনা মেলিয়া তারি ধ্যানে আছে রত।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃ: ৯৪]

(৫)

সেই রূপই তার শত্রু হইল, পণ্যের মত তারে,
বিয়ে দিল বাপ দুই মুঠি ভরি টাকা আধুলির ভারে।

[সখিনা, পৃঃ ১]

(৬)

মেঘ মুক্ত আকাশের মত দাঁড়াল যখন এসে,
রূপ যেন তারে করিতেছে স্তব সারাটি অঙ্গে ভেসে।

[সখিনা, পৃঃ ৩]

(৭)

এ লতা বাঁধন জনমের মত কখনো যেন না টুটে,
যত ভালবাসা ফুলের মতন রহে যেন এতে ফুটে।

[সখিনা, পৃঃ ৭]

(৮)

হ্যাচড়া পুজোর ছড়ার মত ফুরফুরিয়ে ঘোরে,
হেথায় হোথায় যথায় তথায় মনের খুশীর ভরে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ২]

(৯)

"না, না, কাজ নেই, সত্য বলত মোরে ভাল লাগে তব?"
"খুব ভাল লাগে, কত ভাল লাগে মুখেতে কেমনে কব!
যেমন ক্ষেতেতে মই দিতে লাগে যেমন কাটিতে ধান,
আটির উপরে আঁটি বেঁধে যাই খুশীতে ভরিয়া প্রাণ।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৪৯]

(১০)

থামল রূপাই ঠাটা যেমন মেঘের বুকে বান হানিয়া,
নাগ-নাগিনীর ফণায় যেমন তুবড়ী বাঁশীর সুর হাঁকিয়া।
গর্জে উঠে গাঁয়ের লোকে, লাটিম হেন ঘোড়ার লাঠি,
রোহিত মাছের মতন চলে, লাফিয়ে ফাটায় পায়ের মাটি।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৫৭]

জসীম উদ্‌দীন তাঁর উপমার উপকরণের ভেতর নদী, আকাশ, ফুল, চাঁদ, সূর্য, ঝড়, বিদ্যুৎ, লতা-পাতা, তারা, দীঘি, পাখি ইত্যাদি নানা অনুসঙ্গ উপস্থিতির মাধ্যমে অসাধারণ সৌন্দর্য সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কিছু উদাহরণ–

(১)

আসমান সমপতির গরব,
আসিও না তাহে এতটুকু কালি দিতে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৪২]

(২)

ওই বাহু দুটি ফুলের মতন গাঁথিয়া লইতে গলে
ওরা যেন আজ সাপ হয়ে তারে দংশিছে নানা ছলে।

[সকিনা, পৃঃ ১১]

(৩)

চাঁদের মতন মুখখানি নয়, তবু মনে হয় চাঁদ,
একাদশী রাতে আকাশে যে ওঠে তারেই করিয়া সাধ।

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ৯]

(৪)

সোজন আসিয়া জাম গাছটিরে আগডালে যেন উঠি,
মেঘের মতন কালো জামগুলি তুলিতেছে মুঠি মুঠি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১০]

(৫)

"যাও ছাড় লাগে," "এবার বুঝিনু বউ তবে কথা কয়,
আমি ভেবেছিনু সব বউ বুঝি পাখির মতন হয়।"

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৯৮]

২। উৎপ্রেক্ষা

যে অলংকারে নিকট সাদৃশ্যের জন্য উপমেয়কে উপমান বলে প্রবল সংশয় জাগে, তাকে উৎপ্রেক্ষা অলংকার রূপে পরিচিত। "যে সকল ভাব আমাদের অন্তরে রসের সঞ্চার করে কেবল সেগুলিকে রূপ দেওয়াই নয়, ভাষার সাহায্যে নানা রকমের রসোদ্ভাবক চিত্র রচনা করাও কবিতার এক প্রধান কাজ। আর সেজন্য ধ্বনি ও ছন্দের মতো রূপকল্পনা ও ইমারজেন্সী কবিতার ভাষায় অত্যাবশ্যক। শব্দের বাহুল্য পরিহার করবার জন্য কবিতায় শব্দময় চিত্তের আমদানী করা একান্ত প্রয়োজন। উপমা এদিক দিয়ে খুব ফলপ্রসূ। উপমার প্রয়োগেই হচ্ছে রূপকল্পনার এক সুপ্রাচীন দৃষ্টান্ত। উপমা রূপকের পরে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় উৎপ্রেক্ষা। এই উৎপ্রেক্ষাও উপমা রূপকের মত তুলনামূলক অলংকার। উৎপ্রেক্ষা বা উৎপ্রেক্ষণ শব্দের অর্থ বিতর্ক, সংশয় বা সম্ভাবনা।"

[সুধীর কুমার দাশ গুপ্ত, ১৯৬৩, পৃঃ ৮১]

এই উৎপ্রেক্ষা অলংকারগুলোর মধ্যে যেন, বোধ হয় বুঝি, মনে হয়, সন্দেহ ইত্যাদির সমাবেশ থাকে। এই সব শব্দ বাক্য মধ্যে থাকে তখন তাকে বলে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা বা বাচ্যে উৎপ্রেক্ষা আর এই শব্দ না থাকলে অর্থাৎ শব্দগুলি উহ্য থাকলে তখন প্রতীয়মান উৎপ্রেক্ষা। নিম্নে জসীম উদ্‌দীনের কাহিনীকাব্যে উৎপ্রেক্ষা অলংকারের ব্যবহার দেখান হল -

(১)

এ বাড়ি যায় ও বাড়ি যায়, গানে মুখর গাঁ,
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ছে যেন রাম শালিকের ছা।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ২০]

(২)

দুখাই ঘটক নেচে চলে নাচে তাহার দাড়ি,
বুড়ো বটের শিকড় যেন চলছে নাড়ি নাড়ি।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ৪১]

(৩)

কৌতূহলী গাঁয়ের লোকে শুনছে পেতে কান,
জুমজুমেরি পানি যেন করছে তারা পান।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ৪৩]

(৪)

সব গাঁর লোক এক হল আজ রূপার ছোট উঠান পরে,
নাগ-নাগিনী আসল যেন সাপ খেলানো বাঁশীর সুরে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃ: ৫৭]

(৫)

রামনগরের নায়েব মশায় সেই চাকারে হস্তে ধরে,

স্বয়ং শূলচক্রপাণি বিরাজ করেন গ্রামের পরে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৩৮]

(৬)

দেহ সে তার পদ্মের পাতা, ঘটনার জল-দল,

গড়ায়ে পড়িতে রূপেরে করেছে আরো সে সমুজ্জল।

[সকিনা, পৃঃ ২]

(৭)

হাঁটিতে আছাড়ি পড়ে হেসে কুটি কুটি,

পাকা তেলাকুচ সেল নাচে ঠোঁট দুটি।

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ৪২]

জসীম উদ্‌দীন প্রকৃতি বর্ণনামূলক আরো কতগুলি উৎপ্রেক্ষা যা তার কবি প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর-

(১)

মাঠের মাঝে জলীর বিলের জোলো রঙের টিপ,

জ্বলছে যেন এ গাঁও ও গাঁর বিরহেরি দীপ!

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ১০]

(২)

সোজন যেন বা তটিনীর কূল, দুলালী নদীর পানি,

জোয়ারে ফুলিয়া ঢেউ আছাড়িয়া করে কূল টানাটানি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৯]

(৩)

দুলালী সে যেন বনের হরিণী, সোজন তাহার বন,
লতা পাতা ফুল ছায়া বিছাইয়া হরণ করিছে মন।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৯]

রূপক

উপমার পরই রূপকের অবস্থান। রূপকও প্রাচীন অলংকার। যে অলংকারে উপমেয়ের সঙ্গে উপমানের অভেদ কল্পনা করা হয়, তা রূপক অলংকার হিসাবে পরিচিত। "স্বরূপে অর্থাৎ বস্তুগতভাবে উপমেয় উপমান বিভিন্ন হলেও তাদের অতিসাম্য দেখবার জন্যই কাল্পনিক অভেদারোপের নাম রূপক। রূপক অভেদ প্রধান অলংকার ঠিক অভেদ সর্বস্ব নয়। উপমান অলংকারে উপমেয়টি মূল্যবান; কিন্তু রূপকে মূল্যবেশী উপমানের।"

[শ্যামাপদ চক্রবর্তী, ১৩৬৩, পৃঃ ৬৫]

"রূপকালংকারে উপমান ও উপমেয়ের অভেদ নানাভাবে প্রদর্শিত হতে পারে অর্থাৎ রূপক বা রূপের আরোপ নানাভাবে হয়ে থাকে। কখনো উপমেয় ও উপমান সমাসবদ্ধ না হয়ে ব্যাসবাক্যে (ব্যস্তভাবে) অবস্থান করে এবং 'রূপ' এই অভেদ বাচক শব্দ দ্বারা উভয়ের অভেদত্ব সূচিত হয়।'

[জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, ১৩৬৪, পৃঃ ২৭৯]

"কখনও কখনও উপমেয় ও উপমান সমাসবদ্ধ হয়ে সমস্ত পদরূপে অবস্থান করে।'

[জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, ১৩৬৪, পৃঃ ২৭৮]

জসীম উদ্‌দীন কাহিনী কাব্যগুলোতে এই রূপকের প্রয়োগ সাবলীলতার সাথে করেছেন। তিনি প্রকৃতি লালিত সন্তান। তাই দেখা যায় কাব্যমধ্যে উপমা উৎপ্রেক্ষার গ্রামীণ রূপ অতি সাধারণ বস্তুর মতো রূপকের অপরূপ সমারোহ ঘটিয়েছেন। নিচে উদাহরণ দেয়া হল-

(১)

লোহুর সাগরে সাঁতার কাটিয়া দিবস শেষের বেলা,
রাত্র-রাণীর কালো আঁচলেতে মুছিল দিনের খেলা।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৬২]

(২)

মাঝ খানেতে জলীর বিলে জ্বলে কাজল-জল,
বক্ষে তাহার জল-কুমুদী মেলছে শতদল।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৯]

(৩)

সেখানে নিতুই কত তারা ফুল ফুটিয়া হাসে।
সেথায় গাঁথিয়া তারার মালা সে বসিবে চাঁদের পাশে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৩]

(৪)

উদয় তারায় আকাশ-প্রদীপ দুলিছে পুবের পথে,
ভোরের সারথী এখনো আসেনি রক্ত ঘোড়ার রথে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৬]

(৫)

বিস্ময়ে সে যে অবাক মানিয়া চাহে ফুল-দেহ পানে,
চুড়ি ঝুম ঝুম দুটি রাঙা হাত বাঁকা ফুল ধনু টানে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ১০]

(৬)

রাম ধনু পাড় ছিঁড়িল শাড়ীর দেহ রামধনু খানি,
দূর গগনের রামধনু এসে করিতেছে টানাটানি।

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ১১৩]

(৭)

বাহু দুইখানি ঘুরাইতে যেন গান বেজে ওঠে সুরে।
দেহ বীণাখানি কাঁপিছে তারেতে আকাশের বাণীপুরে।

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ২১]

(৮)

হায় বনফুল, সেই ডালে তুই দিয়েছিলি পাতি বুক,
সেই ডালেরি, সাথে ভাঙিয়া পড়িল তোর সে সকল সুখ।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৬৩]

(৯)

সে বন-বিহঙ্গ কাঁদিতে জানে না, বেদনার ভাষা নাই,
ব্যাধের শায়ক বুকে বিঁধিয়াছে জানে তার বেদনাই।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৩৪]

(১০)

ক্ষণেক থামিয়া রহিল আদিল, সারাটি অঙ্গে তার।
কোন অদম্য হিংসা পশু যে নড়িতেছে অনিবার।

[সকিনা, পৃঃ ২১]

(১১)

কত কথা আজ মনে পড়ে আর, অভাগী বালিকা হায়,
বলেছিল এই কলঙ্কিনীরে জড়ায়োনা স্নেহ-ছায়।

[সকিনা, পৃঃ ৪০]

(১২)

জানি না সে কোন কথা-অমৃত, কোন সে মধুর ভাষা,
তবু আজ মোর নিশিদিশি ভরি জাগিতেছে মনে আশা।

[সকিনা, পৃঃ ৭২]

সমাসোক্তি

কোন অচেতন পদার্থের উপর চেতন পদার্থের গুণ ক্রিয়া ব্যবহৃত হলে অচেতন পদার্থটি চেতন পদার্থের মতো কাজ করে তখন সমাসোক্তি অলংকার হয়। জসীম উদ্‌দীন তাঁর কাহিনীকাব্যের ভেতর প্রচুর অচেতন পদার্থকে চেতন পদার্থে পর্যবসিত করেছেন সমাসোক্তি অলংকার সৃষ্টি করে। প্রকৃতির সহজ স্বাভাবিকতা ধরা পড়ে তাঁর কবিতায়। নিচে তাঁর কাহিনীকাব্যে সমাসোক্তি অলংকারের ব্যবহার দেয়া হলো-

(১)

দুখের রজনী যদিও বা কাটে আসে যে দুখের দিন,
রাত দিন দুটি ভাই বোন যেন দুখেরই বাজায় বীণ।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৬৮]

(২)

মাঠে মাঠে কাঁদে কলমীর লতা, কাঁদে মটরের ফুল,
এই একা মাঠে কি করিয়া তারা রাখিবে গো জাতি-কুল।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৬৮]

(৩)

দীঘিতে তখনো শাপলা ফুলেরা হাসছিলো আনমনে,
টের পায়নিক পাণ্ডুর চাঁদ ঝুমিছে গগন কোণে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৬]

(৪)

রহিয়া রহিয়া মজার খুলিতে বাতাস দিতেছে শীস,
সুরে সুরে তার শিহরি উঠিছে আঁধিয়ারা দশদিশ।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৭]

(৫)

পার্শ্বে তাহার ঘুমায় সকিনা, মরি মরি কিবা অলস সোনার বস্তু,
সারাটি অঙ্গে লেগে আছে যেমন নিপরাধের বড় পবিত্র চুম।

[সকিনা, পৃঃ ১৪]

(৬)

দিবসের সহ-মরণ-চিতায় আপনারে দিতে তুলে,
সন্ধ্যা সাজিছে নানা আভরণে নাহিয়া নদীর কূলে।
পিছনে চলেছে তারকা সখীরা কাঁদিয়া ঝিলী স্বনে,
একে একে তারা ঝাঁপায়ে পড়িবে সখীর চিতার কোণে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৫৯]

জসীম উদ্‌দীনের এই চারটি কাহিনীকাব্যের প্রকরণের ভাষা, অলংকার আলোচনায় এই কথা সুস্পষ্ট যে তিনি বাণীভঙ্গিমার সাথে সাথে অলংকারের সুষ্ঠু প্রয়োগে তিনি নিখুঁত কারিগর। একজন দক্ষ রূপকার হিসাবে তিনি তাঁর কাব্যকে রসঘন ও সজীব করতে যেমন ভাষা ব্যবহার করেছেন তেমনি তাকে অলংকৃতও করেছেন।

ছন্দঃ

জসীম উদ্‌দীনের কাহিনী কাব্যের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য আলোচনায় ভাষা, অলংকারের পরই আসে ছন্দের বিষয়। ছন্দ হলো কাব্যকে একটি নিয়মনীতির মধ্যে আবদ্ধ করা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ''কথাকে তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ।'

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৪৭, পৃঃ ২৯৭]

"কথাকে বেগ দিয়ে আমাদের হৃদয়ের সামগ্রী করে তোলার জন্যেই ছন্দের দরকার। তাই শ্রেষ্ঠ কবিকে একজন শ্রেষ্ঠ ছান্দসিকও হতে হয়। জসীম উদ্‌দীন তাঁর কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সুসুসমঞ্জসিত ছন্দরূপেরই সাধনা করেছেন সারা জীবন। তাঁর কাব্য বিষয়ের ন্যায় ছন্দেও দেখি লোক জীবনের সহজ ছন্দ স্রোতেরই স্বীকৃতি রয়েছে। তিনি একে আপন প্রয়োজনানুসারে গড়ে পিটে নিয়েছেন। তাঁর প্রিয় ছন্দ স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত। কারণ কাব্যের বাণীভঙ্গিতে যে কাব্যরীতির পেষকতা তিনি করেছেন।"

[সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৩, পৃঃ ২১৮]

"ঐ দুই ছন্দেই তা বেশি খোলতাই হয়।"

[আবু হোনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী, আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত, ২০০১, পৃঃ ১১৪]

"পল্লী নিয়ে কাব্য লিখলেও পল্লী কবিদের গীতি ছন্দকে ক্ষেত্র বিশেষে সোজন বাদিয়ার ঘাট, সকিনা ও মা যে জননী কান্দে কাব্যত্রয়ে প্রয়োগ করলেও, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পল্লী কবিদের সুরাশ্রয়ী অপূর্ণাঙ্গ গীতিছন্দ আধুনিক উপন্যাস ধর্মী কাহিনী কাব্যের প্রকৃতির সাথে তেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; বাস্তবানুগ বর্ণনায় ও বিশ্লেষণে, গভীর ও সূক্ষ্ম বিষয় চিত্রণের জন্যে ছন্দ তেমন সাহায্য করে না। তাই সীমিত ক্ষেত্রেই কাব্যের প্রয়োজন তা প্রয়োগ করেছেন।"

[সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৮৩, পৃঃ ২১৮]

জসীম উদ্‌দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' কাব্য বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে মোট চৌদ্দটি অধ্যায়ের মধ্যে নয়টি অধ্যায় স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা আর বাকি পাঁচটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা।

আবার 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় বাইশটি অধ্যায়ের মধ্যে স্বরবৃত্ত রচিত অধ্যায় এক, দুই, পাঁচ, ছয়, বারো, পনের, ষোল ও সতের। বাদ বাকি সব কটি অধ্যায় রচিত মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। বস্তুত জসীম উদ্‌দীন ছিলেন স্বরবৃত্ত ছন্দের দক্ষ কারিগর, মাত্রা বৃত্তের ক্ষেত্রেও তিনি সমান ভাবে পারদর্শী।

জসীম উদ্‌দীন কাহিনীকাব্যে স্বরবৃত্ত যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তার উদাহরণ দেওয়া হল-

ক) স্বরবৃত্ত ছন্দ

(১)

"খড়ি কুড়াও সোনার মেয়ে! শুকনো গাছের ডাল,
শুকনো আমার প্রাণ নিয়ে যাও, দিও আশার জ্বাল।
শুকনো খড়ি কুড়াও মেয়ে! কোমল হাতে লাগে,
তোমায় যারা পাঠায় বনে বোঝেনি কেন আগে?"

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ২৫]

(২)

'কিরে বেটা বকিস নাকি?' কনের চাচা হাঁকে,
জালি কলার পাতার মত গা কাঁপে তার রাগে।
"কোথায় গেলি ছদন চাচা, ছমির শেখের নাতি,

দেখিয়ে দেই দুলার চাচার কতই বুকের ছাতি।
বেরো বেটা নওসা নিয়ে, দিব না আজ বিয়া"
বলতে যেন আগুন ছোটে চোখ দুটি তার দিয়া।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৪৫]

(৩)

সাপের মত দুলাও ফণা ঝড়ের মত গর্জি ওঠ
ঘূর্ণিপাকে ঘুরিয়ে লাঠি কাজীর চকের মধ্যে ছোট।
দলে দলে লোক সাজিল, হাতে হাতে জ্বলল মশাল,
কালবোশেখীর ঝড় ছটিল, চৌদিকেতে সামাল-সামাল।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৯১]

স্বরবৃত্ত ছন্দে লঘু কৌতুক বর্ণনে ও নর-নারীর রূপ বর্ণনার মাধ্যমে জসীম উদ্‌দীন যে দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন তা অতীব সুন্দর। তিনি এই ছন্দ ব্যবহারে সার্থকতার পরিচয় দিয়েছেন।

খ) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ

(১)

আজো এই গাঁও অঝোরে চাহিয়া ওই গাঁওটির পানে,
নীরবে বসিয়া কোন কথা যেন কহিতেছে কানে কানে।
মধ্যে অথই শুনো মাঠখানি ফাটলে ফাটলে ফাটি;
ফাগুনের রোদে শুখাইছে যেন কি ব্যথার মুক মাটি।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৭৮]

(২)

আহারে দারুণ দুখের বন্ধু,
কি করম দোষে অভাগী দুলীর লাগি,
এত যে কাঁদন কাঁদিতেছে তুমি
স্বেচ্ছায় হয়ে আমার ব্যথার ভাগী।
আগে যদি আমি জানিতাম সখা।
পিরীতির গাছে শুধু ফোটে কাঁটা ফুল।
জনম না হতে আপনার হাতে,
কাটিতাম তারে উপাড়িয়া জল-মূল।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১৩১]

(৩)

নমুর পাড়ায় প্রভাত হইল, তারকাব্রতের
আলপনা আঁকা রঙিন আঙন-খানি।
আসিল উষসী হাসিয়া হাসিয়া তাহারি উপরে
আলতা ছোপান পায়ের আঁখর টানি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৫৬]

(৪)

লোহু লয়ে আজ সিনান করেছি, রক্তে ভেসেছে নদী,
বুকের মালা যে ভেসে যাবে তাতে আগে জানিতাম যদি।
আঁচলের সোনা খসে যাবে পথে আগে যদি জানিতাম।
হায় হায় সখি, নারিনু বলিতে কি যে তবে করিতাম!

[নক্সী-কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৬৩]

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রতি কবির আগ্রহ কম ছিল। ফলে এই অক্ষর বৃত্ত ছন্দের ব্যবহার তাঁর কাব্যে বিরল। তবে জসীম উদ্‌দীন তার গ্রাম্য ভাব-ভঙ্গীর টিকিয়ে রাখতে কাব্যের মধ্যে মাঝে মাঝে গ্রাম্য গীতিছন্দ ব্যবহার করেছেন। এই ছন্দ সম্পর্কে কবির অভিমত, "তাঁর মতে বাংলা পয়ারে ধ্বনি বৈচিত্র্য কম, আর গীতিছন্দ ও পায়েরই দোসর। পার্থক্য এই যে লোক কবিরা ইচ্ছেমতো বিচিত্র শব্দের ফোঁড়ন দিয়ে তাতে কিছুটা ধ্বনি বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিলেন।"

[জসীম উদ্‌দীন, মা যে জননী কান্দে, ১৯৬৩, পৃঃ ৯]

কাব্যে পল্লীর আবহ ধরে রাখার জন্য কবি অনেক সময় গ্রাম্য গীতি ছন্দের প্রয়োগ করেছেন।

(১)

ঢাকার নবাব, দিলেন জবাব, হাজার মুসলমান,
পদ্মা নদী পার হইয়া ঘিরিল আসমান।
এলো কাজেম খুনী, শব্দে শুনি বন্দুকেরী গুলি,
আলীর নামে ডাক ছাড়িয়া মুখেই নিত তুলি।
এলো ছদন মাল, জুতিরকাল বিঁধত না যার চামে,
সাত আটদিন লড়াই করে গা নাহি তার ঘামে।
এলো বচন মিঞা কোনা দিয়া ইছেম আজম পড়ি,
ফুঁক ছাড়িল হাজার লেঠেল পড়ত গড়াগড়ি।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১১২]

(২)

"এইনা পন্থে গেছে ফকির ধলেশ্বরী বায়া,
গাঙের ঘাটে ঘাটে সারিন্দা বাজায়া।
কতেক দূরে যায়া পাবা গোদা গাড়ীর ঘাট,
তারও পরে দেখতে পাবা নেতা ধুপনীর পাট।"

[সকিনা, পৃঃ ৪৫]

(৩)

'বট বিরিক্ষি জাইনা মাগো, আইল ছায়ার তরে,
সেও বিরিক্ষি ভাঙ্গিয়া পইল তোরই গায়ের পরে।'
তিন জনে বইসা কান্দে বেইড়া কুঁড়ার থালা
অন্তরীক্ষে কি করে জানি আপে বারিতালা।

[মা যে জননী কান্দে, পৃঃ ৪৩]

জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে ভাষা, ছন্দ, অলংকার ব্যবহারের সঙ্গে চিত্রকল্পের প্রয়োগও লক্ষ করা যায়। এর ফলে কাব্যের মধ্যে ঘটনাসম্বলিত ছবি পাঠক চিত্তে ভেসে ওঠে। নিম্নে কাহিনীকাব্যগুলির মধ্যে চিত্রকল্পের উপস্থাপনা লক্ষ্যণীয়–

চিত্রকল্প-

(১)

বাতাসের পায়ে বাজে না আজিকে ঝলমল মল গান,
মাঠের ধুলায় পাক খেয়ে পড়ে কত যেন হয়ে ম্লান।
সোনার সীতারে হয়েছে রাবণ, পল্লীর পথ পরে,
মুঠি মুঠি ধানে গহনা তাহার পড়িয়াছে বুঝি ঝরে।

[নক্সী কাঁথার মাঠ, পৃঃ ৭৮]

(২)

মাথার উপরে আটনে ছাটনে বেতের নানান কাজ,
ফুলচাং আর শিকাগুলি ভরি দুলিতেছে নানা সাজ।
বনের শাখায় পাখিদের গান, উঠানে লতার ঝড়ে
সবগুলি মিলে নির্জনে যেন মহিমা বধিছে তার।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৯৬]

(৩)

তারপর শেষে বরণ করিয়া বিদায় করিল তারে,
পাল ভরে নাও যতদূর গেল চেয়ে রল একাধারে।
সুদূর চরের আকাশের কোলে আবছা কুহেলী জালে।
নৌকা মিশিল, তারপর পাল মিশে গেল এককালে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ১০৬]

(৪)

মটরের ডাল, মসুরের ডাল, কালিজিরা আর ধনে,
লঙ্কা-মরিচ রোদে শুকাইছে উঠানেতে সযতনে।
লঙ্কার রঙ, মসুরের রঙ মটরের রঙ আর,
জিরা ও ধনের রঙের পাশেতে আলপনা আঁকা কার।
যেন একখানি সুখের কাহিনী নানান আখরে ভরি।
এ বাড়ির যত আনন্দ হাসি আঁকা জীবন্ত করি।
সাঁঝ সকালের রঙিন মেঘেরা এখানে বেড়াতে এসে,
কিছুখন যেন থামিয়া রয়েছে এ বাড়িবে ভালবেসে।

[সোজন বাদিয়ার ঘাট, পৃঃ ৯৩]

জসীম উদ্‌দীনের এই চারটি কাহিনী কাব্য সার্থক হওয়ার পেছনে প্রকরণগত প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের অবদান বিদ্যমান।

জসীম উদ্‌দীনের কাহিনী কাব্যের প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ভাষা, ছন্দ, অলংকার, বাণীভঙ্গী, চিত্রকল্প বিশ্লেষণে আধুনিক শিল্পী মনের পরিচয় ফুঠে উঠে। কাব্য মধ্যে প্রতিটি অধ্যায়ের যে শক্ত আটসাঁট অথচ সুন্দর বুনুনি তাতে তাঁকে রূপশৈলী নির্মাণের রাজার মুকুট পরাতেই হয়। তাঁর কাহিনীকাব্যগুলোর মধ্যে ছন্দের যে চলার গতি, অলংকারের যে ধ্বনি বৈচিত্র্য, আঙ্গিকের যে প্রচলতা, চিত্রকল্পের যে মনোরম ব্যবহার তা তাঁকে সার্থক শিল্পীর শিরোপা দান করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়
উপসংহার

উপসংহার

জসীম উদ্‌দীন বাংলা সাহিত্যের এক সংকটাপন্ন অবস্থায় হাল ধরেছিলেন। বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তিনি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে দেননি। তাই ঠুনকো নাগরিক বৈভবে যারা নিমজ্জিত হতে চলেছিল, তাদেরকে তিনি পল্লীর সবুজ শ্যামলিমার দিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন তাঁর সাহিত্যিক দক্ষতার গুণে। পল্লী গ্রামের প্রতি কবির ছিল অপরিসীম মমত্ববোধ। জসীম উদ্‌দীনই সর্বপ্রথম পল্লীর সহজ-সরল নর-নারীর জীবনের বাস্তব অনুভূতিগুলো দরদ দিয়ে এঁকেছেন। তাঁর আগে এই ধারায় অন্যান্য কবিগণের বিচরণ থাকলেও তা সীমিত পর্যায়ে। এ ক্ষেত্রে জসীম উদ্‌দীন একচ্ছত্র সার্থকতার দাবিদার।

জসীম উদ্‌দীন পল্লী নিয়ে কাব্য রচনা করতে গিয়ে কোথাও হোঁচট খাননি। তিনি তাঁর কাব্য মধ্যে পল্লীর উপাদান নিয়ে অবলীলায় উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। তাঁর উপমাগুলো একেবারে জীবন্ত। তা পল্লীর মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর থেকে সংগৃহীত। তাঁর চারপাশে বিস্তৃত ছিল পল্লী গ্রামের বিশাল উপাদান। যার ফলে সেখান থেকে ইচ্ছেমত উপাদান সংগ্রহ করে নিজের কবিত্ব শক্তির প্রখর দীপ্তির ছটায় তাকে বর্ণিল করে তুলেছেন।

বিশেষ করে তাঁর কাহিনীকাব্যগুলোর বিষয়বস্তু ও প্রকরণ নির্মাণে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর কাহিনীকাব্যের বিষয়বস্তুর তুলনামূলক আলোচনা, কাহিনী গ্রন্থন এবং প্রকরণগত দিক বিশ্লেষণে দেখা যায় তিনি পল্লী উপাদান নিয়ে অত্যন্ত সুকৌশলে ও সুশৃঙ্খল বাণী বিন্যাসে তাঁর কাব্য দেহ গঠন করেছেন। মূলত কাহিনীকাব্যের পটভূমি বিনির্মাণে তিনি বরাবর সমসাময়িক কালের বাস্তব চিত্র তুলে এনেছেন।

১) তাঁর 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যে চর দখল নিয়ে যে দুই গ্রামের ভেতর দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন তা বাস্তবে সংঘটিত হত এবং এই দাঙ্গায় প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হত। জসীম উদ্‌দীন পল্লীর এই দাঙ্গার চিত্র বাস্তবে অবলোকন করেছিলেন যার ফলে এর নিখুঁত বর্ণনা তিনি দিতে পেরেছেন। যেমন-

মার মার মার, হাঁকল রূপা, 'মার মার মার' ঘুরায় লাঠি,
ঘুরায় যেন তারি সাথে পায়ের তলে মাঠের মাটি।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ' পৃঃ ৬০]

আবার কিছু লোকবিশ্বাসের বর্ণনা দিয়েছেন যা পল্লীর সাধারণ মানুষ দীর্ঘকাল মেনে এসেছে। এই লোক বিশ্বাসেরও বাস্তব চিত্র কবি তুলে ধরেছেন। যেমন-

কালো মেঘা নামো নামো, ফুল-তোলা মেঘ নামো,
ধুলট মেঘা, তুলট মেঘা, তোমরা সবে ঘামো।
কানা মেঘা, চলমল বারো মেঘার ভাই,
আরও ফুটিক ডলক দিলে চিনার ভাত খাই।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ' পৃঃ ২০]

প্রচন্ড খরায় বৃষ্টি না নামলে গ্রামের মেয়েরা বদনা বিয়ে দিয়ে মেঘ রাজার গান করে। তাদের বিশ্বাস এর ফলে আশু বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে। পল্লীর লোকাচারও তার কাব্যে স্থান পেয়েছে। বাড়িতে অতিথী আসলে মোরগ ধরে খাওয়ানো, শীলত পাটি বিছিয়ে তাকে সমাদর করা। নিচের চরণে তা বেশ পরিস্ফুট–

যাহোক রূপাই বাঁশ কাটিয়া এল খালার বাড়ি.
বসতে তারে দিলেন খালা শীতল পাটি পাড়ি।
বদনা ভরা জল দিয়ে আর খড়ম দিল মেলে,
পাও দুখানি ধুয়ে রূপাই বসল বামে হেলে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ' পৃঃ ২৮]

জসীম উদ্‌দীন পল্লীর নর-নারীর হৃদয়ের আর্তি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যার জন্য তার 'নক্সী-কাঁথার মাঠ' কাব্যে দেখা যায় এক গ্রামের কিশোর ছেলের বাঁশির সুর অন্য গ্রামের কিশোরী মেয়ের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। যেমন–

এ-গাঁয় চাষী নিঘুম রাতে বাঁশের বাঁশির সুরে,
ওইনা গাঁয়ের মেয়ের সাথে গহন ব্যথায় ঝুরে।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ' পৃঃ ১০]

পল্লীর তরুণ-তরুণী প্রেমে পড়লে গ্রামে যে কানা-ঘুষা হয় তারও সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন কবি। আবার বিভিন্ন কুৎসা রটানো বন্ধ করার জন্য তরুণ-তরুণীর বিয়ের নিখুঁত ছবি তিনি এঁকেছেন। পল্লী নারীর বিয়ের পর স্বামী একমাত্র অবলম্বন কিন্তু স্বামী ফেরারী হলে অপেক্ষারত নারীর যে ট্রাজিক পরিণতি ঘটেছে তার চিত্র কবি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী করে অঙ্কন করেছেন।

উপমা অলংকার ব্যবহারে জসীম উদ্‌দীনের ছিল যাদুকরী শক্তি। তিনি পল্লীর কিশোর-কিশোরীকে নানা উপমা অলংকারে সজ্জিত করেছেন। যেমন কাব্যে নায়িকা সাজুর রূপ বর্ণনায় কবি বলেছেন-

কচি কচি হাত পা সাজুর, সোনায়, সোনায় খেলা,
তুলসী তলায় প্রদীপ যেন জ্বলছে সাঁঝের বেলা।

[নক্সী-কাঁথার মাঠ' পৃঃ ১৮]

২) কবি পল্লীর নর-নারীর কৈশোর বয়সের নির্ভেজাল প্রেমের সাথে সাথে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বটিও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাঁর 'সোজন-বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে দেখিয়েছেন। এই দ্বন্দ্বে যে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাত থাকে তা স্পষ্ট। অসবর্ণ বিয়ে সমাজ সমর্থিত নয়, যার ফলে তার কাব্যের নর-নারীকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে তাদের জীবন দিয়ে। আবার কুচক্রি মহলের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ নমু ও মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে, পুনরায় সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এবং অত্যাচারিত মানুষগুলি যে এক সময় কুচক্রি মহলের উপর চরম প্রতিশোধ নিতে পারে তারও বাস্তবরূপ জসীম উদ্‌দীন তাঁর 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' কাব্যে তুলে ধরেছেন।

৩) সময়ের সাথে সাথে জসীম উদ্‌দীন তাঁর কাব্যের পটভূমিও পরিবর্তন করেছেন। তার 'সকিনা' কাব্যে নির্ভেজাল প্রেমের পরিবর্তে প্রেমে এসেছে দ্বান্দ্বিকতা। এখানে অসহায় এক নারী সমাজের লম্পটদের ভোগের সামগ্রী হয়ে অন্তর্জ্বালায় মরেছে। একজন নারী সমাজের বিভিন্ন দিক থেকে কীভাবে প্রতারিত হয় এবং শেষে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে তা দেখিয়েছেন কবি। তিনি শুধু পল্লীর নর-নারীর সহজ-সরল রূপই তুলে ধরেন নি সমাজের হাতে নিগৃহীত এক নারীর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বও পাঠককে উপহার দিয়েছেন।

৪) 'সকিনা' কাব্যে নারীর প্রথম ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর মধ্য দিয়ে তিনি নারীর অধিকার আদায়ের বিষয়টি, স্পষ্টভাবে 'মা যে জননী কান্দে' কাব্যে আমিনা চরিত্রের মাধ্যমে ঘটিয়েছেন। আমিনা জননী সত্তার বিকাশ ঘটানোর জন্য জমিদার গৃহ থেকে পালিয়ে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে

মাতৃত্বের গৌরব অর্জন করে। যদিও এই কাঙ্ক্ষিত সন্তানকে সে বুকে আগলে রাখতে পারেনি।

দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে বাঁচানোর জন্য সন্তানকে চিরদিনের জন্য পর করে দিতে হয়। জসীম উদ্‌দীন মানব দরদী কবি। তাই আমিনা চরিত্রের ভেতর যে সমাজবিরোধী কর্মকান্ড পরিলক্ষিত হয় তাকে তিনি ঢেকে ফেলেছেন জননী সত্তার বিকাশ ঘটিয়ে। যার ফলে আমিনাকে আর কুলটা মনে হয় না তা এক দুঃখিনী নারী হৃদয়ের করুণ হাহাকারে পর্যবসিত যা পাঠককে বেদনাঘন করে তোলে।

জসীম উদ্‌দীন অত্যন্ত শিল্পসম্মতভাবে তাঁর কাহিনী কাব্যগুলো রচনা করেছেন। বাল্য থেকে কৈশোর পর্যন্ত তিনি ছিলেন পল্লীর স্নেহে লালিত সন্তান। তাই শিক্ষা-দীক্ষার জন্য শহরের সংস্পর্শে থাকলেও তার মানসলোকে প্রতিনিয়ত আনাগোনা ছিল, পল্লীর মেঠোপথ-ঘাট, কলমিলতা, পাকা ধান, বেথুলবন এসব কিছু। এছাড়া একজন গ্রাম্য গীতির সংগ্রাহকের জন্যও তিনি পল্লীর কাছাকাছি হতে পেরেছিলেন। পল্লীর এই সাধারণ বস্তুগুলো তাঁর কাব্যে হয়ে উঠেছে অসাধারণ। জসীম উদ্‌দীন ছিলেন আধুনিক পল্লী কবি। তিনি পল্লী নিয়ে কাব্য রচনা করলেও, তাঁর কাব্য পাঠে যে পরিমিতি জ্ঞান ও রুচিবোধ ধরা পড়ে তা গ্রাম্য কবি থেকে স্বতন্ত্র। তাঁর কাহিনী কাব্যগুলোর ভেতর যে সজাগ শিল্পীর পদচারণা ঘটেছে তা তাঁর কাব্যের ভাষা, ছন্দ, অলংকার, বাণীভঙ্গীমার কলা-নৈপুণ্য দেখেই বোঝা যায়। ফলে তিনি তাঁর কবিত্ব শক্তির বলে যে কাহিনী কাব্যগুলো রচনা করলেন তা পাঠকুলকে মন্ত্র মুগ্ধ করে।

গ্রন্থপঞ্জি

ক. মূল গ্রন্থসমূহ ঃ

জসীম উদ্‌দীন- নক্সি-কাঁথার মাঠ, পলাশ প্রকাশনী, ১৯২৯, ঢাকা।

জসীম উদ্‌দীন-সোজন বাদিয়ার ঘাট, ১৯৩৩, ঢাকা।

জসীম উদ্‌দীন-সকিনা, পলাশ প্রকাশনী, তৃতীয় সংস্করন, ১৯৭৫, ঢাকা।

জসীম উদ্‌দীন - মা যে জননী কান্দে, ১৯৬৩, ঢাকা।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ঃ

অণীক মাহমুদ - জসীম উদ্‌দীনের কাব্যে বিষয়বৈচিত্র্য ও শিল্পরূপ, অনন্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৫।

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত - কল্লোল যুগ, এম.সি.সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৭, কলিকাতা।

আনিসুজ্জামান ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত - আবু হেনা মোস্তফা কামাল রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, 'শিল্পীর রূপান্তর' বাংলা একাডেমী, ২০০১।

এ.কে.এম. আমিনুল ইসলাম - জসীম উদ্‌দীন (কবি ও কাব্য), সিটি পাবলিশার্স - ১৯৫৬, ঢাকা।

গাউসুর রহমান - জসীম উদ্‌দীন ও অন্যান্য, রিদম প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৫, ঢাকা।

জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী- সাহিত্য দীপিকা, প্রকাশনা মহালয়া, ১৩৬৪, কলকাতা।

তিতাস চৌধুরী - জসীম উদ্‌দীন: কবিতা গদ্য ও স্মৃতি, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৮৬, ঢাকা।

বিমল গুহ - আধুনিক বাংলা কবিতায় লোকজ উপাদান, জসীম উদ্‌দীন-জীবনানন্দ দাশ-বিষ্ণুদে, বাংলা একাডেমী, ২০০১, ঢাকা।

মোহিতলাল মজুমদার-কবি ও কাব্য : সাহিত্য বিচার, প্রকাশকাল-১৮৭৯, কলকাতা।

মিঞা লুৎফার রহমান ও ফজলুল হক সৈকত সম্পাদিত - জসীম উদ্‌দীন ঐতিহ্যের অহংকার, শোভা প্রকাশ, ২০০৩, ঢাকা।

মাসুম হামীদ সম্পাদিত - জসীম উদ্‌দীন সমীক্ষা, দিব্য প্রকাশ, ২০১০, ঢাকা।

সুধীর কুমার দাস গুপ্ত, 'কাব্য-শ্রী' এ মুখার্জী এন্ড কোঃ প্রাইভেট লিঃ, ১৯৬৩, কলকাতা।

সমালোচনা - জসীম উদ্‌দীনের নক্সী কাঁথার মাঠ, পলাশ প্রকাশনী, ১৯৯৮, ঢাকা।

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় - জসীম উদ্‌দীন: কবি মানস ও কাব্য সাধনা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, ঢাকা।

সেলিমা খালেক - জসীম উদ্‌দীনের কবিতা অলংকার ও চিত্রকল্প, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, ঢাকা।

সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় - জসীম উদ্‌দীন, নসাস, ১৯৬৭, ঢাকা।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী-অলঙ্কার চন্দ্রিকা, ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩৬৩, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রবীন্দ্র রচনাবলী : একবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৪৭।